ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 18, No. 1, June 2021

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas
Volume 18, No. 1, June 2021

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India.
& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Tapas Basu
Ex. Professor, Department of Bengali, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumder
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

বাংলা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে - লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় : ভাবনার আলোকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্দীপ দাস	3
নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে মঙ্গলকাব্য : অন্বেষণ ও পর্যালোচনা	সুনির্মল বিশ্বাস	11
সখের থিয়েটারে পুরুষ অভিনেতাদের স্ত্রী-চরিত্রাভিনয়	ধ্রুবজ্যোতি পাল	20
মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটকের (নির্বাচিত) বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য	ঈশিতা মণ্ডল	28
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উত্থান	কমল মাঝি	36
প্রতিবাদের গল্প : নকশাল আন্দোলন	প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল	42
রিপোর্টাজের আলোকে ননী ভৌমিক	সঞ্জয়কুমার দাস	48
A Brief Revisit on the Issue of Caste in West Bengal : Historical Relevance from Antiquity to the Present	Biswajit Haldar	55
Service to the Nation : Revisiting the Thoughts of Swami Vivekananda	Debashis Mazumdar	68
Literary Adaptation in *"Salomé (1923)": Salomé, Medusa, Différance and Iterability*	Afsana Khatoon	80
The Notion of Uncanny in Marleen Gorris' Mrs Dalloway : A Freudian Reading	Subhashish Sadhukhan	88
Literature as an Effective Tool for English Language Teaching/Learning	Shubhaiyu Chakraborty	94
Text to Talkie : Exploring Shades of Women in Indian Film Adaptations	Pragya Bajpai	101

OPEN EYES

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় : ভাবনার আলোকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্দীপ দাস

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায়' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৪) নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের কোনও ইতিহাস নেই। ইউরোপীয়গণ বহুকাল ধরে ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই বিষয়ে ভারতবাসীগণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। বিংশ শতকের (১৯০৭-০৮ খ্রিঃ) গোড়ার দিক থেকেই বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনা চলছে। যদিও বিংশ শতকের প্রথম পাদে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে অন্য কোনও ব্যক্তিকে তেমন ভাবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তাই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ইউরোপীয়গণই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পথপ্রদর্শক। কিন্তু তাই কি? এক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা রয়েই যায়—

১) ইউরোপীয় কর্তৃক প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল অতিরঞ্জিত ও অত্যুক্তিপূর্ণ। এর পিছনে কারণও আছে অবশ্য। বঙ্কিম সেই কথাই অনুভব করেছিলেন সর্বপ্রথমে। কারণ আমরা জানি, ঘরের কথা অপরে যতটা না প্রত্যক্ষভাবে জানবে তার চেয়ে ঘরের লোকে ভালো জানবে। তাই ঘরের ইতিহাস অপরে যদি লিখতে বসে, অগত্যা তাতে কিছুটা কল্পনার রঙ চাপবেই। তখন সেটা অতিরঞ্জিত ও অত্যুক্তিপূর্ণ ব্যতীত কি আর হবে?

২) ভারতীয় ইতিহাস কিছুটা এর ফলে খণ্ডিত ইতিহাসে পরিণত হচ্ছিল। কারণ ওই একই। বিদেশি দ্বারা অপর দেশের সমগ্র ইতিহাস খুঁটিয়ে বিচার এবং বিশ্লেষণ করে লেখা সম্ভব নয়। তাদের স্মৃতিতে তাই ইতিহাসের খণ্ডিত রূপই প্রকাশ পায়। এই সূত্রে ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথের 'প্রাচীন ইতিহাস' (Early History of India) গ্রন্থটির নাম করা যেতে পারে।

প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কম-বেশি শুরু হয়েছে। বাংলাতেও এর চেষ্টা শুরু হলেও, এখনও তেমন ভাবে এই প্রাচীন ইতিহাসের দুর্ভেদ্য, কুহেলিকাময়, বিদেশি দ্বারা রচিত অতিরঞ্জিত ইতিহাসের আখ্যায়িকা বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করেনি। তাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়ই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের উন্মোচন ও জনসাধারণের নিকট সেটা নয়নগোচর করা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মূল প্রবন্ধে প্রবেশ করার পূর্বে এই ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কিছু মণীষীর মতামত দিয়ে প্রমাণও করতে চেয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস নেই। তাঁর মতানুসারে বক্তব্যগুলি দেখা যাক—

ক) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এলফিন্‌স্টোন বলেছিলেন, ''অ্যালেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বে কোনও ভারতীয় ঘটনারই কালনির্দেশ করা যায় না।'' (বন্দ্যোপাধায় ৪৫৬)

খ) আবার, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অধ্যাপক কাউয়েল বলেছিলেন—মুসলমান বিজয়ের পূর্বের কোনও ঘটনারই কালনির্দেশ করা যায় না। এরপর ইউরোপীয়গণ দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হলেও সেটা হয়ে ওঠে জনসাধারণের নিকট অতিরঞ্জিত ও খণ্ডিত। অর্থাৎ পূর্ণ ইতিহাসের ছায়া মাত্র।

তাই বিদেশি দ্বারা রচিত ইতিহাসকে সত্য রূপে গ্রহণ করবার পূর্বে ভালো করে বিশ্লেষণ না করে ভারতবাসীর তা গ্রহণ করা উচিত নয় বলেই তিনি মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের একটি প্রবন্ধ ও বিদেশি ঐতিহাসিক স্মিথের রচিত ইতিহাস গ্রন্থের নাম বলেছেন। সেগুলো জনসাধারণের কাছে কঠিন বলে বোধ

দাস, সন্দীপ : প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় : ভাবনার আলোকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 3-10, ISSN 2249-4332

হয়। কারণ এগুলো সবই বিশেষজ্ঞগণের জন্য লিখিত। স্মিথের রচিত ইতিহাসে বুদ্ধের জন্মকাল থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ঘটনাসমূহ আলোচিত, কিন্তু এর পূর্বের ঘটনা তাতে নেই। অতএব রাখালদাসবাবু মনে করেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনেকটা কাল্পনিক উপাখ্যান ও জনপ্রবাদের উপরেই আশ্রিত। কিন্তু এতে ইতিহাসের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পায়। বুদ্ধ-পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাস বৌদ্ধ সাহিত্য, খোদিত লিপি ও মুদ্রা থেকে অনেকটা বর্তমানে আবিষ্কার করা গেছে। এই সময়ের (বুদ্ধের জন্মের পরবর্তী থেকে মুসলমান বিজয়) ইতিহাসই উদ্ধারের উপায় বলতে রাখালবাবু কিছু বিশেষ উপাদানের প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। যেমন—

১) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান

২) বিদেশিয় সাহিত্যে ভারতীয় প্রাচীন ঘটনাসমূহের বিবরণ

৩) খোদিত লিপিসমূহে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

৪) প্রাচীন মুদ্রা

ভারতীয় সাহিত্য বলতে গেলে, সাধারণত সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য বোঝায়। এক্ষেত্রেও সেই অর্থই ধরা হল। ভারতীয় সাহিত্য বলতে এই তিন সাহিত্যকেই বোঝায় কেন? অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন। তাই এর উত্তরে একটু ইতিহাস ঘেঁটে নিলে সুবিধা হয়—ভারতের দুই স্থানে দুইটি জাতি অতি প্রাচীনকালে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রিস্টীয় ধর্মের শৈশবে সিরিয়া দেশবাসী খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীগণ ভারতের দক্ষিণ কূলে এসে বাণিজ্যের কারণে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে এরাই অনেক দাক্ষিণাত্যবাসীকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেন। এরা সম্ভবত নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টীয়ন। কথিত আছে, একবিংশ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত টমাস ভারতে এসে ধর্মপ্রচার করে যান। সিরিয়বাসী মনে করেন যে, তাঁরা সকলে টমাসের শিষ্য। এরা যাই হোক না কেন, মুসলমানদের অভ্যুত্থানের পূর্ব থেকে যে এরা ভারতে বাস করছেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। এই সম্প্রদায়ের অবস্থা অতি হীন। সুতরাং এদের সাহিত্য-অনুরাগ তত প্রবল ছিল বলে মনে হয় না। এই এক বিদেশিয় উপনিবেশ সম্পর্কে বলা গেল।

অন্যদিকে, ইয়াজদার্জিদ ৩য় পরাস্ত হলে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত পারসিক ধর্মনাশ ভয়ে সমুদ্রপথে পলায়ন করে। এদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সৌরাষ্ট্র নগরে এসে ধর্ম ও প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই গেল দ্বিতীয় উপনিবেশের কথা। বিত্তশালী পারসিক জাতি অতি অল্পকাল হল প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ধারের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু তাতে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোনও কথাই আজও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঐতিহাসিক যুগে শত শত জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে এবং উপনিবেশ স্থাপনও করেছে। কিন্তু আশ্রয়ভিখারি পারসিক ও সিরিয়াজাতি ব্যতীত অপর সকল জাতিই বিলুপ্ত কিম্বা হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তরে মিশে গেছে। শক, যবন, পহ্লব, পারদ, খস, হূণ, দরদ প্রভৃতি সকল জাতিই অবশেষে হিন্দু জাত্যাভিমানের ভিখারি হয়ে স্ব-স্ব বিশেষত্ব লুপ্ত করেছে। অতএব, যে দুইটির অস্তিত্ব আছে, তাদের সাহিত্যের মূল্য অধিক নয়। সেই জন্যই প্রাচীন সাহিত্য বা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য বলতে—সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যকেই বোঝায়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায়' (আষাঢ়, ১৩১৫) নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে এছাড়াও নতুন আবিষ্কৃত দুইটি সাহিত্যের কথাও বলেছেন। যেখানে কম-বেশি ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান মেলে।

প্রথমত, উনিশ শতকের প্রথমদিকে মাদ্রাজের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর ভেকায়্যা ও ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হুল্‌জ্‌ অতি-প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত কতগুলি বীরগাথার আবিষ্কার করেছিলেন। এতে অনেকগুলি দ্রাবিড়বাসীর নাম ও কীর্তিকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, গুজরাটি সাহিত্যে পারসিকগণের ভারতে আগমনের কাহিনী ও সৌরাষ্ট্ররাজ কর্তৃক তাদের অভ্যর্থনার বর্ণনা পাওয়া গেছে, কিন্তু এর সময়নির্দেশ হয়নি বলেই রাখালবাবুর অনুমান—ভট্টার্কবংশীয় বলভীরাজগণের মধ্যে কোনও একজন পারসিকগণকে আশ্রয় প্রদান করেছিল বলেও তিনি দাবী করেন। এই গেল ভারতীয় সাহিত্য বলতে

তিন সাহিত্যের পক্ষে যুক্তির সঙ্গে দুই নব আবিষ্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গ। এবার এই তিন সাহিত্যে ইতিহাস উদ্ধার প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যাক।

১) পালি সাহিত্য

পালি সাহিত্য মূলত ভারতীয় হলেও বিদেশে বর্ধিত হয়েছিল। মহাযানের অভ্যুত্থানের পর পালি ক্রমশ স্বদেশ থেকে তাড়িত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, হিন্দুধর্মের পুনরুভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ অর্থাৎ পালি সাহিত্য তাড়িত হয়ে বিদেশে আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু আর একটা কথা এখানে বলে রাখি, বৌদ্ধ সাহিত্য বলতে কেবল পালি সাহিত্য বোঝায় না। বৌদ্ধ সাহিত্য— কেবল ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য নানা ভাষায় রচিত। বাংলা, মৈথিলী, প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত নানা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য-গ্রন্থও আছে। অধিকাংশ হীনযানীয় গ্রন্থই মূলত পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল। পালি সাহিত্যের আয়তন অতি সামান্য, কিন্তু পালি সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থই ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান। সেই কারণেই হয়তো, ঐতিহাসিকদের কাছে পালি সাহিত্যের আদর অপেক্ষাকৃত অধিক। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল থেকে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। এই সময়ের একমাত্র ইতিহাসের উপাদান পালি সাহিত্য। এই প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে ত্রিপিটক গ্রন্থের কথা বলেন। রাখালবাবুর কথায়—

> ''প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্যাম দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ইউরোপে নীত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তদীয় 'বুদ্ধদেব' নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে ত্রিপিটকের আবিষ্কার কাহিনী বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ত্রিপিটকের নানা স্থলে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।'' (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫৫)

সত্য কথা, ত্রিপিটক থেকেই একটু পরিশ্রম করলেই তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের আখ্যায়িকা, সামাজিক অবস্থা, ধর্মমত প্রভৃতি জানা যাবে। ত্রিপিটক থেকে বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজাদের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে এবং হচ্ছেও। ত্রিপিটক থেকে বৈশালীর পরাক্রান্ত লিচ্ছবি জাতির বিবরণ ও বৃদ্ধি বা বর্গি জাতির সাধারণতন্ত্রের বিবরণ সংগৃহীত। বুদ্ধচরিত গ্রন্থের ভিত্তিও বোধ হয় ত্রিপিটক। মহাযানী ত্রিপিটকে এই সকল উপাখ্যান বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং সেই কারণেই হয়তো, পালি ত্রিপিটক অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন।

পালি ভাষায় যে দুটি ইতিহাস আছে, সেগুলো ভারতীয় নয়। কারণ সিংহলদেশে 'মহাবংশ'[১] রচিত হয়েছিল। অন্যদিকে 'দীপবংশ'[২] গ্রন্থটিও একই। মহাবংশ থেকে রাজা অশোকের সমসাময়িক ঘটনার ইতিহাস রচিত। মহাবংশকে এককথায় বলা চলে বৌদ্ধ ইতিহাসের রত্নাকর। অশোক চরিত্র সম্পর্কে যে ভুরি-ভুরি গ্রন্থ নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার প্রধান উপাদান এই 'মহাবংশ' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি বহুপূর্বে সিংহলের টর্নুর (Turnour) অনুবাদ করেছিলেন, যদিও আজ তা দুষ্প্রাপ্য। আরবি ভাষাতেও এটি অনূদিত হয়। মহাবংশের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বিষয়ে একটি বিষয় ব্যতীত কোন সন্দেহ নেই। বিষয়টি হল, 'বুদ্ধদেবের মহা-পরিনির্বাণের কাল'। সিংহলে প্রচলিত নির্বাণানন্দ থেকে বোঝা যায় যে, ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারে ৫৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ হয়েছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ইউরোপীয় জগতের গণনার মূল অশোকের খোদিত লিপিসমূহের ত্রয়োদশ অনুশাসনে পাঁচজন যবন বা যোন রাজার নাম পাওয়া যায়। নিম্নে ক্রমশ—

আংতিয়াক, তুরময়, আংতিকিনি, মক ও আলিকসুন্দর।

১) আংতিয়াক—আন্তিয়াক (Antiochos)

২) তুরময় — তুলময় —টলেমি বা টলেমায়োস্ (Ptolemy or Ptole - maios)

৩) আংতিকিনি — আন্টিগোনাস্ (Antigonus or Antigonues)

৪) মক - মগ্ (Magas)

৫) আলিকসুন্দর — আলিকসুংদং — আলে সান্দ্রে। (Alexander or Alexandros)

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধানুসারে (লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় - দ্বিতীয় প্রবন্ধ) অশোকের ত্রয়োদশ অনুশাসনে উল্লিখিত পাঁচজন রাজার যে ইতিহাস আছে, ইতিহাসটি অনেকটা এইরূপ—

আংতিয়াক বা Antiochos নামে অশোকের পূর্বে তিনজন রাজা ছিলেন। আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি সিলিউকস ৩১২ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে অপরাপর সেনাপতিদের পরাজিত করে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন সেটা হিন্দুকুশ পর্বত থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সিলিউকসের পুত্র আন্তিয়োক ১ম ও তাঁর পুত্র আন্তিয়োক ২য়। আন্তিয়োক ২য়-এর পুত্র সিলিউকস ২য় ও তাঁর পুত্র আন্তিয়োক ৩য়। অশোকের শিলালিপি অনুসারে উক্ত পাঁচজন রাজাই ছিলেন সমসাময়িক। এক আন্তিয়োক ৩য় ব্যতীত অপর কোনও আন্তিয়োকের রাজত্বকালে গ্রিক অধিকারে পূর্বোক্ত নামধারী পাঁচজন সমসাময়িক রাজা পাওয়া যায় না। সুতরাং অশোকের শিলালিপির আন্তিয়োক যোন রাজা সিরিয়ারাজ ৩য় আন্তিয়োকস্ ব্যতীত অপর কেউ নয়, এটা বোঝা গেল। মহাবংশের মতে বুদ্ধের নির্বাণের ১৫০-১৬০ বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। সুতরাং তদানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ১১৭ খ্রিস্টাব্দে নন্দবংশের উচ্ছেদ করেন। যদিও জৈন ঐতিহাসিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে মহাবংশ-রচয়িতা স্থবির মহানামের মতৈক্য দেখা যায়। কিন্তু আলেকজান্দারের অনুচর বলে গেছেন— ভারতের প্রাচ্য সীমান্তাধিপতির পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracettus আলেকজান্দারের শিবিরে এসেছিলেন। অতএব জৈন ও বৌদ্ধমতে আস্থা স্থাপন করতে হলে গ্রিক ঐতিহাসিকদের মিথ্যা বলতে হয়।

আবার কোন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে, চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন খ্রিস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে এবং আলেকজান্দারের শরণাগত যুবক তাঁর পৌত্র ও তক্ষশীলা নগরীর তৎকালীন শাসনকর্তা অশোক। কিন্তু অশোককে ৩২৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ফেলতে গেলে শিলালিপিগুলিকে জাল অথবা পরবর্তী অপর কোনও রাজা কর্তৃক খোদিত বলে স্বীকার করতে হয়। এখন অশোক তাঁর জীবনের প্রারম্ভে নৃশংসাচরণের জন্য 'কালাশোক' বা 'চণ্ডাশোক' নামে খ্যাত হন। এখানেই একটু সমস্যা হল, 'মহাবংশ' প্রণেতা স্থবির মহানাম তাঁর পূর্বপুরুষদের গণনায় ভ্রম ও প্রবাদের সত্যতার সামঞ্জস্য করতে গিয়ে চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে কালাশোক নামে অপর একজন রাজার সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এটাই মহাবংশের একমাত্র কলঙ্ক; তথা গ্রন্থের দোষ ধরা পড়ে। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''কালাশোক ও ধর্মাশোক দুই জন পৃথক ব্যক্তি।'' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৫৯)

অশোকের খোদিত লিপিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—

১) পর্বতগাত্রস্থ খোদিত লিপি।

২) শিলাস্তম্ভগাত্রস্থ খোদিত লিপি।

৩) শিলাস্তম্ভ, গুহা, পর্বতগাত্র প্রভৃতি জায়গায় খোদিত শিলালিপি।

এর মধ্যে পর্বতগাত্রে ১৪ টি ও স্তম্ভগাত্রে ৭ টি অনুশাসন পাওয়া যায়। পর্বতগাত্রে প্রথম সাতটি ও স্তম্ভগাত্রে অনুশাসনগুলি এক নয়। দ্বিতীয়ত, স্তম্ভগাত্রে মোট সাতটি অনুশাসন আছে; সেখানে স্তম্ভগাত্রে যবন রাজাদের নাম নেই। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায়বাবু বলেছিলেন—

> ''স্তম্ভানুশাসনগুলি পূর্ববর্তী কালাশোক কর্তৃক ও পর্বতগাত্রস্থ অনুশাসনগুলি পরবর্তী অশোক কর্তৃক খোদিত।'' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৫৮)

কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি বিষয় উপেক্ষা করে গেছেন। সে বিষয়টি হল—'অক্ষরতত্ত্ব'। বুলার প্রণীত 'ভারতীয় অক্ষরতত্ত্ব' ইংরাজিতে অনূদিত করেন ফ্লিট। অশোকের খোদিত লিপিসমূহের অক্ষর-তত্ত্ব আলোচনা করে দেখা গেছে—

১) এলাহাবাদ, রাধিয়া, মাথিয়া, রামপুরয়া ও কপিলাবস্তু স্তম্ভলিপির অক্ষর অন্যান্য অশোকের অক্ষর থেকে বিভিন্ন হলেও দিল্লীর স্তম্ভলিপি ও ধৌলির পর্বতলিপির অক্ষর একই রূপ।

২) অশোকের সময়েও আর্যাবর্তে স্থানভেদে অক্ষরসমূহের আকার-ভেদ হয়েছিল।

সুতরাং, দুইজন অশোকের অস্তিত্ব খোদিত লিপি থেকে প্রমাণ করা যায় না। দুইজন অশোকের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে অশোককে আন্তিয়োক ৩য়-এর সমসাময়িক বলে স্বীকার করতে হবে। সুতরাং অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকেই যবন ঐতিহাসিক কর্তৃক বর্ণিত সান্দ্রাকোতস্ বলে স্বীকার করতে হবে। তা হলেই বুদ্ধদেবের মৃত্যু অনুমান ৪৭৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ঘটেছিল বলতে হবে। সে যাই হোক, লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে পালি সাহিত্যকে আমাদের 'হারানিধি' বলতে হবে। পালি সাহিত্যচর্চা ভারত ও বঙ্গদেশে বাড়ছে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে, এই যা ভরসা!

২) সংস্কৃত সাহিত্য

ঐতিহাসিকের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্য অধিক নয়। কারণ, অন্যান্য দেশের মতো কেবলমাত্র সাহিত্য অবলম্বন করে ভারতের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, কতকগুলি ইংরাজ ঐতিহাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের অযথা অনাদর করেছিলেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যতটুকু পাওয়া গেছে, ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

প্রথমত, প্রকৃত ইতিহাস। কহলনের 'রাজতরঙ্গিণী'। স্টাইন দ্বারা এই ইংরাজি অনুবাদে ভ্রম থাকলেও, গ্রন্থের অনুক্রমণিকা অংশটি আদরণীয়। তবে কলহনের ইতিহাস গ্রন্থটিও খুব একটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, তিনি গ্রন্থের অনেক স্থানেই পৌরাণিক ইতিহাসের বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে কাশ্মীরের প্রাচীন-ইতিহাস সংকলনে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। রাখালদাস মনে করেন, এই ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্ধার করা যাবে একমাত্র কাশ্মীরের প্রাচীন মুদ্রার অক্ষরতত্ত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ করে।

দ্বিতীয়ত, জীবনচরিত। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' সর্বজনবিদিত। এই জীবনীগ্রন্থ থেকে থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধনের ও তাঁর সময়কালের ইতিহাস পাওয়া যায়। গ্রন্থে ইতিহাস বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, যেখান থেকে পাঠক বুঝতে পারবে হর্ষচরিত গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য—

> "অথ কদাচিদ্রাজা রাজ্যবর্ধনং কবচহরমাহূয় হূণান্ হন্তুং হরিণানিব হরির্হরিণেশকীশোরমপরিমিতবলানুজাতং চিরন্তনৈমরাত্যৈরনুরক্তৈশ্চ মহাসামন্তৈঃ কৃত্বা সাভিসারমুত্তরাপথং প্রাহিণোৎ।" (পঞ্চম উচ্ছ্বাস্ / দ্বিতীয় মূল)

এছাড়াও, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে পালবংশীয় রাজা রামপালদেবের জীবনচরিত আবিষ্কার করেন। প্রাচ্য মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় জানিয়েছিলেন, তিনি 'শ্যামবর্মচরিত' নামক বাংলার বর্মবংশীয় রাজা শ্যামল বর্মদেবের জীবনী আবিষ্কার করেছেন। এই বর্মবংশের ইতিহাস যদিও খুব প্রাচীন নয়। আর চরিত গ্রন্থে রাজা শ্যামলের ও তাঁর রাজ্যকালের কথার ইতিহাস-সত্যতা কতখানি, সেই বিষয়ে রাখালদাস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদিও হরি বর্মদেবের রাজত্বকালীন একটি খোদিত লিপি উড়িষ্যায় ও একটি তাম্রশাসন পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু শ্যামল বর্মের নাম এর পূর্বে কেউ শোনেনি। পশ্চিম-ভারত থেকে বিহ্লনের লেখা রাজা বিক্রমাঙ্কদেব'কে নিয়ে 'বিক্রমাঙ্কচরিত' আবিষ্কৃত হয়। ঐতিহাসিক স্মিথের গ্রন্থে— হর্ষচরিত ও বিক্রমাঙ্কচরিত ব্যতীত অন্য কোন জীবনচরিতের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, সাধারণ সাহিত্য। সাধারণত হস্তলিখিত পুস্তকমাত্রেরই শেষভাগে বা শুরুতে গ্রন্থের, গ্রন্থকারের ও লেখকের নামের সঙ্গে রাজার নাম ও তার রাজ্যাঙ্ক, বা অন্য কোনও নাম পাওয়া যায়। যা অনেক সময় ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। যেমন হর্ষচরিত জীবনীকাব্য হলেও এর বিপরীত হয়নি। 'হর্ষচরিত' গ্রন্থ থেকে

জানতে পারি—

> ''কান্যকুব্জ রাজ মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বাণভট্টের আবির্ভাব। বাণভট্টের সম্রাটদত্ত উপাধি ছিল 'বশ্য-বাণী-কবি-চক্রবর্তী' এবং হর্ষবর্ধনের উপাধি ছিল 'পরম-মহেশ্বর-রাজচক্রবর্তী'। হর্ষের রাজত্বকাল ৬০৬ খৃস্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। অতএব ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাণভট্টের জীবৎকাল ধরা যায়।'' (চক্রবর্তী ১৫)

এই প্রসঙ্গে বলি, ইতিহাসের লুপ্ত উপাদান গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মিলবে। অন্য আরেকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা রাখি। 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের পঞ্চম উচ্ছ্বাসে এক অংশে দেখতে পাই, রাজা তাঁর এক পার্ষদকে বাণভট্ট সম্পর্কে বলছেন—

> ''মহান্ অয়ং ভুজং''৭ যা শুনে বাণের উক্তি এইরূপ 'ব্রাহ্মণোহস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যানানাম্, যথাকাল মুপনয়নাদয়ঃ কৃতাঃ সঙ্গস্কারাঃ। সম্যক্ পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ। শ্রুতাণি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি ..... কা মে বুজঙ্গতা?'' (পঞ্চম উচ্ছ্বাস)

সংস্কৃত সাধারণ সাহিত্য সম্পর্কে রাখালদাস বলেছিলেন, এই সাহিত্য থেকে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পেলেও, সেগুলো যেন সর্বাংশে সত্য নয়। তাকে অন্য উপায়ে সত্য বলে মেনে নিতে হয়। কি এই অন্য উপায়? তাহলে কি সাধারণ সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত ইতিহাসের ঐতিহাসিক মূল্য গৌণ? এর উত্তর খুঁজে পেতে পারি বিশাখদত্ত বিরচিত 'মুদ্রারাক্ষসম্' নাটক থেকে—

> ''মুদ্রারাক্ষস' নাটকের কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নাট্যকার বিশাখদত্ত তাঁর এই নাটকের কাঠামোটুকু প্রাচীন আকর গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন মাত্র, নাট্য কাহিনীর অধিক অংশই নাট্যকারের স্বকল্পিত রচনা। তাই এখানে ঐতিহাসিক পরিবেশ নাটকের পটভূমি হলেও ইতিহাস এখানে গৌণ, ঐতিহাসিক বাতাবরণে সৃষ্ট কবিকল্পনাই নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে।'' (আচার্য্য এবং দাস ১৬)

অর্থাৎ, মুদ্রারাক্ষস নাটকে যতই আমরা খ্রিস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথম পাদে নন্দবংশকে সমূলে উৎখাত করে মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রতিষ্ঠাবিষয়ক ঐতিহাসিক ঘটনা বা তার সমকালীন ঘটনা পাই না কেন, এখানে সেই ইতিহাসকে সত্য বলে গ্রহণ করতে আমাদের একটু দ্বিধা বোধ হয়। কারণ, ওই ইতিহাস কবিকল্পিত, ও ইতিহাসের পটভূমি মাত্র।

পুরাণেও ঐতিহাসিক উপাদান মেলে। যেমন—বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু ও মৎস্যপুরাণে। তবে সমস্ত পুরাণই বৌদ্ধ বা জৈন রাজগণের নাম স্পর্শ করেনি একবারও, এটাও কিছুটা অবাক করার বিষয়। বিষ্ণুপুরাণে গুপ্তবংশের ইতিহাস মেলে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে, কৌটিল্য মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য-অভিষিক্ত করেন, তার ইতিহাস—

> ''মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোহতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোহখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা।। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতে।। .....। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি।।'' (বিষ্ণুপুরাণ; চতুর্থাংশ-১৪৯/৪-৭)

৩) প্রাকৃত সাহিত্য

প্রাকৃত ভাষায় আজ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশই জৈনধর্মসম্বন্ধীয়। এই জন্য অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক প্রাকৃত সাহিত্য বললে জৈন সাহিত্য বুঝে থাকেন। জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহে ঐতিহাসিক অনেক কথা থাকলেও, অতি প্রাচীনকালের ঘটনাবলী অত্যন্ত দুর্লভ। জৈন ধর্মশাস্ত্র অতি প্রাচীন হলেও, বর্তমান গ্রন্থগুলি তত পুরাতন নয়। দুই-তিনবার জৈনগণ অত্যাচারে পীড়িত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ গুলি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত, সকল জৈন গ্রন্থই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সংস্কৃতের ন্যায় প্রাকৃত সাহিত্যেও ঐতিহাসিক

মূল্যানুসারে গ্রন্থ-সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে—

প্রথমত, ইতিহাস। মেরুতুঙ্গের নাম ক্যানিংহামের অনুগ্রহে অনেকেই এখন আমরা জানি। মেরুতুঙ্গের বিষয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর পরবর্তী বলে রাখালবাবু মত প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়ত, জীবনচরিত। প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'কুমারপালচরিত' গ্রন্থে রাজা কুমারপালের সময়কালের ইতিহাস জানতে পারা যায়। জৈন সাহিত্যের অধিকাংশই অজ্ঞাত। এই কারণে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শুনি—

> ''জৈন পুরোহিতগণ সাগ্রহে গ্রন্থগুলি শিক্ষিত বা বিদেশীয়গণের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখেন, সুতরাং কত রত্ন যে এখনও মালব ও সৌরাষ্ট্রে ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে।'' (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩)

তৃতীয়ত, সাধারণ সাহিত্য। জৈন, হরিবংশ, পুরাণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই প্রাচীন লুপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলি, কোনও কোনও সাহিত্যরথী 'গৌড়বধ' কাব্যখানিকে ঐতিহাসিক কাব্য বিবেচনা করে বাঙালির গৌরবকাহিনী ঘোষণা করেন। কিন্তু গৌড়বধের কাহিনী সত্য হওয়া সম্ভব নয়; কারণ সে সময়ে কোনও কাশ্মীরাধিপতির পক্ষে সমুদয় উত্তরভারত জয় করা স্বপ্ন বলে মনে হয়। আর যদি সত্য হয়, তবে সে গৌড় যে বঙ্গদেশ, তার প্রমাণ কী? আসলে জৈন সাহিত্যের চর্চা বা বিশেষ আলোচনার অভাব এখনও আছে বলে মনে করি। প্রায় কুড়ি বছর পরিশ্রম করে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য যে সমুদয় জৈন বা প্রাকৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় মুষ্টিমেয়।

মোটামুটি ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে (পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত) ভারতীয় লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় ও ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে আশা করি একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন করা গেল। এবার প্রবন্ধের শেষপর্যায়ে উপস্থিত হয়ে ইতিহাস উদ্ধারে দ্বিতীয় উপাদান তথা বিদেশীয় সাহিত্যে ভারতীয় ঘটনাসমূহের উল্লেখ কীভাবে দেখাতে চেয়েছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; সেগুলো ক্রমপর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে—

(ক) বিদেশিয় গ্রন্থাকারগণের মধ্যে হেরোডোটাস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এছাড়াও আলেকজান্দারের সহযাত্রীগণ ও তাঁর উত্তরাধিগণের দূত-সমূহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ লিখে গেছেন। গ্রীকগণের ভারত-বর্ণনার অতি সামান্য অংশ এখন পাওয়া যায়, এবং যা পাওয়া যায় তাও অতিরঞ্জিত বর্ণনামাত্র।

(খ) চিনদেশিয় ইতিহাস গ্রন্থেও পর্যটকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ বৃত্তান্তে ভারতীয় ঘটনাসমূহের প্রভূত উল্লেখ আছে। সুঙ্-য়ুন, হিউয়েন সং, ফা-হিয়েন, ইচিং প্রভৃতি পর্যটকগণের ও সু-মাশিন্ পান্‌কু, মাটোয়ানলিন্ প্রভৃতি ইতিহাসকারগণের গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহু উল্লেখ দেখা যায়।

(গ) মুসলমান ইতিহাসকারগণও ভারতসম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'তহকিক-ই-হিন্দ্' প্রণেতা আবু রিহান্ (আল্‌বেরুণী) সুপরিচিত। আরব ইতিহাসকারগণ কাসিন কর্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের ঘটনা ও তুর্কি ইতিহাসবেত্তাগণ ভারতবিজয়-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. মহাবংশ—শ্রীলঙ্কার রাজাবলি মহাবংশ গ্রন্থে নথিভুক্ত বুদ্ধঘোষের বিস্তারিত জীবনী এবং বুদ্ধঘোষুপ্পত্তি নামে পরিচিত পরবর্তীকালে রচিত একটি জীবনীগ্রন্থ।

২. দীপবংশ—শ্রীলঙ্কার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক রেকর্ড। খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি অষ্টকথা এবং অন্যান্য উৎস থেকে দীপবংশ গ্রন্থটি সংকলিত বলে বিশ্বাস করা হয়। মহাবংশের সঙ্গে একসাথে এটি শ্রীলঙ্কা ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বহু বিবরণের উৎস। এর গুরুত্ব কেবল ইতিহাস এবং কিংবদন্তির উৎস হিসাবেই নয়, বৌদ্ধ ও পালি সাহিত্যের একটি প্রাথমিক কাজ হিসাবেও রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা

১. আচার্য, সীতানাথ ও দাস, দেবকুমার। সম্পাদক। মুদ্রারাক্ষসম্। সদেশ। কলকাতা-০৬।
২. চক্রবর্তী, অলকা। সম্পাদক। হর্ষচরিতম্। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলকাতা-০৬।
৩. চক্রবর্তী, দিলীপকুমার। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাস। ইতিহাস গ্রন্থমালা ৬। অশীন দাশগুপ্ত সম্পাদিত। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা-০৯।
৪. চক্রবর্তী, রণবীর। ভারত - ইতিহাসের আদিপর্ব। ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাক সোয়ান। কলকাতা-৭২।
৫. দে, গৌরীশঙ্কর ও দে, শুভ্রদীপ। ভারতবর্ষের ইতিহাস। প্রগতিশীল প্রকাশক। কলকাতা-৭৩।
৬. দাশগুপ্ত, অংশুপতি। অতীতের উজ্জ্বল ভারত। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা-৭৩।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায়। সাহিত্য। অগ্রহায়ণ ১৩১৪।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায়। সাহিত্য। আষাঢ় ১৩১৫।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। ইতিহাস চিন্তা। কমল চৌধুরী সম্পাদিত। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।
১০. বিশ্বাস, দিলীপকুমার ও ভট্টাচার্য, অমিতাভ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড। সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। কলকাতা-১৩।
১১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। কলকাতা-১৩।
১২. সেন, প্রবোধচন্দ্র। বাংলার ইতিহাস-সাধনা। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। কলকাতা-১৩।

সন্দীপ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে মঙ্গলকাব্য : অন্বেষণ ও পর্যালোচনা

সুনির্মল বিশ্বাস

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে। মঙ্গলকাব্য নিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু হল স্বাধীনতার পর থেকে। যদিও প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে মঙ্গলকাব্যের বিশেষ ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে কিছু আখ্যানধর্মী গদ্যকাহিনি রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে মনে আসে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কথা। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি অযত্নে পড়ে থাকা দেশজ কাব্যকথাকে তুলে আনলেন। মঙ্গ লকাব্যের দুই নারী বেহুলা ও ফুল্লরাকে নিয়ে যথাক্রমে দুটি গদ্যকাহিনি লিখলেন 'বেহুলা' ও 'ফুল্লরা'। এরপর প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুকে নিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গলের গল্প : কালকেতু', ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গ ল অনুসরণে 'খুল্লনা বা মর্ত্তলোকে চণ্ডীর পূজাপ্রচার' নামক একটি সচিত্র গদ্যকাহিনি লেখেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'খুল্লনা', চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী 'কালকেতু' ও 'শ্রীমন্ত', বটকৃষ্ণ পাল 'শ্রীমন্ত সওদাগর', আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীমন্ত', সতীপতি বিদ্যাভূষণ 'শ্রীমন্ত', বিপিনবিহারী নন্দী 'চন্দ্রধর', চারুশীলা দেবীর 'বেহুলা' উল্লেখযোগ্য।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা ও আধিপত্যের পিছনে থাকে তার ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি। মার্কস যাকে বলেছেন 'Economic Determinism'। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণিগত পার্থক্য প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে অর্থই শ্রেণিবিভাজনের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। অর্থের জোরে সংস্কৃতি এক কনজিউমার গুডস্। আর্থিক বৈষম্য মানুষকে তার সংস্কৃতির শিকড় থেকে দূরে ঠেলে দেয়। কাজেই আধিপত্যবাদের থাবা থেকে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করা প্রয়োজন। একালের কবি-সাহিত্যিকেরা পুরাতন কাব্যকথা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন নতুন আঙ্গিকে। দেশজ মূল্যবোধগুলিকে জাগ্রত বাস্তবতায় পরিবেশন করেছেন। তাঁরা বুঝেছিলেন পুরানো দেশীয় গল্পকাহিনিকে পুনরায় যদি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করা যাবে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় শিল্পীদের স্বাধীনতা থাকে না। শিল্পীদের স্বাধীনতা থাকলে অচিরে জনসম্মুখে শাসকের স্বরূপ প্রকাশ পাবে। ফলে শাসকের সিংহাসনচ্যুতির ভয় থাকে। শাসকও শিল্পীদের কণ্ঠরোধের জন্য নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই শিল্পীরাও নিজেদের শিল্পকর্মে পুরানো কাব্যকথার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাতে তাঁদের শিল্পীসত্তা পেয়েছে স্বাধীনতার সুখ।

ঔপনিবেশিক কালপর্বের থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক অর্থাৎ স্বাধীনতা-পরবর্তী সাহিত্যের অভিমুখটি একটু ভিন্নধর্মী। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে ইংরেজ শাসকেরাই ছিল জাতির প্রধান শত্রু। কিন্তু এই পর্বে অর্থবান ব্যক্তিরা হয়ে উঠলেন দেশ ও সমাজের মাথা। অন্যরা তাদের কাছে পদানত হয়ে রইল। ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্বই প্রবলভাবে দেখা দেয়। স্বাধীন দেশে অর্থবান সুবিধাভোগী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া নিম্নবিত্তের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট হল। এক দেশে বসবাস করেও এই আর্থিক শ্রেণিবৈষম্য সাহিত্যিকদের গভীরভাবে ভাবিয়েছে। তাই তাঁদের অনেকের লেখায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ছাপ পড়েছে। স্থান পেয়েছে ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব। তাঁরা নারীবাদী, মনঃসমীক্ষণ, নিম্নবৃত্ত, পরিবেশবাদী প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিচিত সাহিত্যজগতকে দেখেছেন। সেই কাব্যকাহিনিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। বিশ্বায়ন ও পশ্চিমি দুনিয়ার অর্থনীতি সাহিত্যের চালিকাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রদর্শনের দিক থেকে যেমন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কাহিনি, চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার পাশাপাশি কথনভাগে প্রকাশ পেল সমকালীন যুগভাবনা। সময়ও পেল তার এক নিজস্ব ভিত্তিভূমি।

বিশ্বাস, সুনির্মল : নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে মঙ্গলকাব্য : অন্বেষণ ও পর্যালোচনা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 11-19, ISSN 2249-4332

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও তার ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু সমস্যায় বাংলা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ল। উপন্যাসে অনিকেত ও অন্ত্যজ মানুষের গোষ্ঠীজীবন, ইতিহাস, পারিবারিক সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যার কথা নতুন নতুন আঙ্গিকে উঠে আসল। দেখা যাচ্ছে বহুক্ষেত্রে লেখকেরা তাঁদের এই কথনবিশ্ব গড়ে তুলছেন চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা, রামকথা এবং মঙ্গলকাব্যের কাহিনি ও চরিত্র দিয়ে। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার থেকে মঙ্গলকাব্যে বাঙালির সামগ্রিক জীবনচিত্র আরও স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের সরল আখ্যানের মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে ছিল—একালের বিশিষ্ট সমালোচকেরাও তা স্বীকার করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলকে সামনে রেখেই সমালোচক কৈলাসচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন—

> ''এক্ষণে যে বঙ্গদেশ উপন্যাসমালায় আচ্ছন্ন হইয়াছে বঙ্গভাষায় কবিকঙ্কণই সেই উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা। কবিকঙ্কণ বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস লেখক; তাঁহার উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই; সকল চরিত্রই সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ও সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত। তাঁহার মত সুচিত্রকর সহজে পাওয়া যায় না।''[১]

গোপাল হালদার মুকুন্দ চক্রবর্তীকে প্রথম 'কথাশিল্পী'র মর্যাদা দিয়ে লিখেছেন—

> ''বাঙলা সাহিত্যে যে মানবরসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তা একটা আকস্মিক বিস্ময়। তার নাম ও স্বরূপ তখনো রস-শাস্ত্র স্থির করে উঠতে পারেনি। না হলে মুকুন্দরামের পরিচয় হত কথা-শিল্পে প্রথম বাঙালী কবি হিসাবে, কথা-শিল্পী বলে, বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে।''[২]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> ''মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি উপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।''[৩]

মধ্যযুগের কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্যের কাব্যের আধারে রচিত উপন্যাস। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা অন্নদামঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি সমকালীন সমাজ-সংকটকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, চিত্ত সিংহ, সত্যজিৎ ঘোষ, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সেলিনা হোসেন, শচীন দাস, শিবানন্দ পাল, অভিজিৎ সেন, রামকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালে রূপক সাহা, উদয় কুমার চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখার্জী প্রমুখ লেখক মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে উপন্যাস লিখেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে মঙ্গলকাব্য-আশ্রিত চারটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেই চারটি উপন্যাস হল—অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'চাঁদ মনসার জোট', রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' ও শচীন দাশের 'নদী তরঙ্গের আয়না'।

২

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'চাঁদ মনসার জোট' উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালের যুগান্তর পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১০ সালে এবং মুশায়েরা থেকে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। উপন্যাসে হাওড়ার এক অখ্যাত গ্রামের তিনটি মেয়ের কয়েক ঘণ্টার যাত্রার কথা রয়েছে। রানিবালা, জবা ও পল্লবী জীবন সংগ্রামে

রত। রাতে স্টেশনে রাত কাটিয়ে পাঁশকুড়া থেকে সস্তায় সবজি কিনে কলকাতার বাজারে বেচে তাদের দিন গুজরান করতে হয়। গ্রামীণ জীবনের লোভ, স্বার্থপরতা, ভালোবাসা ও মেয়েদের অস্তিত্বের সংগ্রাম অন্য ভাবে উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। আখ্যানসূত্রে উঠে এসেছে পল্লবীর ব্যক্তিজীবনের কথা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে পল্লবীর বিয়ে হয় বছর তিরিশের যুবক লখাইয়ের সঙ্গে। শারীরিকভাবে অপ্রস্তুত, দরিদ্র লেখাপড়া না জানা পল্লবীর কপালে সুখ জোটেনি। অবহেলিত ও বঞ্চিত সন্তানসম্ভবা পল্লবী তাই বাধ্য হয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসে। তার দাদা রাখাল কুর্তি নিজের মা ও বোনের প্রতি সুবিচার করেনি। তাদেরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে।

অমলেন্দু চক্রবর্তী মনসামঙ্গলের কাহিনি উপন্যাসের সরাসরি আনেননি। চাঁদ, মনসা, বেহুলা, লখিন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মনসামঙ্গলের কাহিনির নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছেন। বেহুলার মত পল্লবীকেও প্রতিনিয়ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়েছে। সে স্বামী, দাদা কারও মুখাপেক্ষী নয়, নিজের পেটের ভাত নিজেই জোগাড় করে সবজি আনাজপাতি বেচে। স্বামী পল্লবীর খোঁজখবর রাখে না। স্বামী-দাদা সবাই তার বিপক্ষে। মনসামঙ্গলের বিষয়ী দাম্ভিক চাঁদ বণিকের মতো তারাও নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতেই সদা-তৎপর। চাঁদ সওদাগর ও বেহুলার বাড়ির লোকজন জানত বেহুলার কপালে অকালবৈধব্য লেখা রয়েছে। মনসার অভিশাপকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই চাঁদ-পুত্র লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ দিয়েছিলেন। চাঁদ কেবল নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন, জেদ ও স্বার্থের কথা ভেবেছেন। আর বেহুলা হয়েছে পুরুষের স্বার্থের বলি। একালের বেহুলা পল্লবীকেও কেউ বুঝতে চায়নি। পরিবারের লোকজন অসম বয়সী যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে। কেউ খবর রাখেনি কেন সে নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। লখিন্দরের মত পল্লবীর স্বামীও নিজের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন করেনি।

> ‘ভেলায় ভাসে দেশগাঁ। ভেলায় ভাসে সে। মরা লক্ষ্মীন্দর নেই আর গাঙুরের জলে। সে-বড় জ্যান্ত মরদ আজ। ভাসে তার বাচ্চা।’[৪]

গ্রাম বাংলার দ্রুত পরিবর্তন, লিঙ্গ-রাজনীতি ও ক্ষমতার গঠনতন্ত্র লেখকের দৃষ্টি এড়ায় না। নারী জাতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি, তাদের লড়াকু মনোভাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন উপন্যাসে। যান্ত্রিক উন্নতিতে মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘোচে না। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে তিন মহিলা সবজি বিক্রেতা। তাদের জীবন গ্রাম-শহর সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে। সামান্য লাভের আশায় পল্লবী, রানিবালা ও জবাদের কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে তারা অতি ক্ষুদ্র অংশীদার। গ্রামীণ শান্তসমাহিত জীবনযাত্রার পরিবর্তে তাদের জীবন ব্যবসার রাজনৈতিক জটিলতা জড়িয়ে যায়। মেয়ে হওয়ার জন্য রাতের অন্ধকার তাদের মনে ভয় সঞ্চার করে। এই অন্ধকার রাত পার করে তারা নতুন সম্ভাবনা দেখতে পাবে।

কলকাতা শহরের ক্রেতা ও মহাজনদের মধ্যেও রয়েছে ক্ষমতা প্রদর্শন ও স্বার্থপর মনোভাব। তাদের সঙ্গে লড়ে যেতে হয় পল্লবীদের। স্বামী, দাদা, সবজি বাজারের বাবু-মহাজনরা হয়ে উঠেছে একালের চাঁদ সওদাগর। মনসামঙ্গলের মনসা বেহুলাকে মাধ্যম করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছিল। পল্লবী শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি-ননদের সাহায্য পায়নি, পেয়েছে শুধু গঞ্জনা। এমনকি শহরের শিক্ষিত দিদিমণি তাকে বাড়ির কাজের মেয়ে বানাতে সদ্য ভালোবাসার মায়াজাল পেতেছে। সবাই নিজের স্বার্থ পূরণে ব্যস্ত। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর ও মনসার বৈরিতার সম্পর্ক থাকলেও একালে নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য পুরুষ চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে নারীরূপী মনসা জোটবদ্ধ হয়েছেন। বেহুলারূপী পল্লবী এই দুই পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা নয় বরং তীব্র লড়াই চালিয়ে গেছে। উপন্যাসে মনসামঙ্গলের প্রচলিত পাঠ ভেঙে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর একক সংগ্রামের নতুন পাঠ রচিত হয়েছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসে বাংলার ইতিহাস, লোকায়ত ঐতিহ্যকে অনায়াসে তুলে আনেন। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের জগতে বিচরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড় সন্ধান করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—

> ''সমাজ যাকে ধরে রেখেছে, জীবনটা যাকে যাপন করে, কণ্ঠ যাকে সুরদান করে তাকেই সৃজনে ও মননে ত্যাগ করেছি আমরা। হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য পরিসরে দু'শ-সোয়া দু'শ বছরে সীমায়িত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলা শব্দভাণ্ডার ছোটো হয়ে গেছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলকে ধরে যে সাহিত্য তৈরি হয়েছিল তার নবপাঠ প্রয়োজন।''[৫]

তাই রামকুমার মুখোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডকে কেন্দ্র করে 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসটি লিখেছেন। উপন্যাসের নামকরণেই চণ্ডীমঙ্গলের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু উপন্যাস লিখতে বসে তিনি চণ্ডীমঙ্গলের গল্প বলতে বসেননি। এমনকি ধনপতির কাহিনির পুনঃপ্রচার করেননি। বণিক খণ্ডের প্রচলিত কাহিনির মধ্যে লেখক নির্মাণ করেছেন এক ভিন্ন কথনবিশ্ব। রচিত হয়েছে পুরাণকথা, দৈবীভাবনা, নারীমনস্তত্ত্ব, ইতিহাসচেতনার সঙ্গে সমকালের যোগসূত্র।

লেখক চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছেন। তবে কথাবস্তু অপেক্ষা কথনশৈলীর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনিতে বারোটি শিরোনামে বিন্যস্ত। শিরোনামগুলি হল—রাজসমীপে ধনপতি, খুল্লনার আতঙ্ক, লহনার আতঙ্ক, দক্ষিণ পাটনে দৈবজ্ঞের নিষেধ, সপ্তডিঙা, বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ, তরণীপূজা, খুল্লনার চণ্ডীপূজা, সাধুর কোপ ও খুল্লনার বিনয়, সদাগরের প্রতি চণ্ডীর ক্রোধ, চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ, ধনপতির ডিঙা ঘাটায় গমন এবং নদীবক্ষে ধনপতি। চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথনের অনুষঙ্গে ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রার কথা পরিবেশ করেছেন। মধ্যযুগের কবিদের ধর্মের প্রতি আনুগত্য ছিল। কিন্তু একালের সাহিত্যিকদের সেই বাধ্যবাধকতা নেই। আছে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় চণ্ডীর মাহাত্ম্যের পরিবর্তে ধনপতির যাত্রাপথ ও নর-নারীর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই কবি মুকুন্দের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বণিক খণ্ডের রত্নমালার উপাখ্যানকে বর্জন করেছেন। একজন আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, অসহায়, যন্ত্রণাকে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়ে লেখক ধনপতি সওদাগরের সাংসারিক জীবনকে বেছে নিয়েছেন। গৌড়দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে ধনপতি সাংসারিক জীবনে মন দিতে চাই। কিন্তু রাজআজ্ঞা পালনের জন্য তাকে সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যতরী ভাসাতেই হবে। দাম্পত্যসুখ ত্যাগ করে দুর্বল ডিঙা নিয়ে জলযাত্রা করতে তার মন চায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দক্ষিণ পাটনে যেতে হয় আর সেখানে ঘটে তার ভাগ্যবিপর্যয়। রাজার আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। অর্থাৎ ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধাচরণের শক্তি যে দুর্বলের নেই—লেখক আধুনিক যুগের এই যন্ত্রণাদীর্ণ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ধনপতির নতুন দ্বীপে যাত্রা, বিপত্তি ও হতাশা তার জীবনকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলেছে। ধনপতি দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা স্বামীর অনুপস্থিতিতে দেবী চণ্ডীর পূজা করতে বসলে ধনপতির তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। চণ্ডীর ঘট পদাঘাতে ভেঙে তছনছ করে দেয়। ধনপতির এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে চান দেবী চণ্ডী। তখনই তাঁর দৈবী মহিমা অপসৃত হয়ে এক সংকীর্ণমনা নারীর রূপ বেরিয়ে আসে। চণ্ডীর হিংস্র মনোভাব ও চারিত্রিক গ্রাম্যতা রামকুমারের উপন্যাসে ধরা পড়েছে। নিজের স্বার্থের কথা ভেবে চণ্ডী সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করেন। ধনপতি ছাড়া মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচলিত হবে না। এই সহনশীলতা তাঁকে বর্তমানকালের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারী সুবিধাবাদী শ্রেণির প্রতিনিধি করে তুলেছে। চণ্ডীকে পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়—

> ''আমার না আছে নাগনাগিনি, ধনার না আছে পুত। বল মা কী উপায় আমার কী উপায় আমার? যদি পূজা না মেলে এই নিশিজাগরণে কী লাভ!''[৬]

ধনপতির সিংহলযাত্রা উপন্যাসে মধ্যযুগের জনপ্রিয় চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিকে একটু ভিন্নভাবে পরিবেশন করতে গিয়ে লেখক দেবীপুরাণ, রামকথা, কৃষ্ণকথার সঙ্গে মনসাকথারও আশ্রয় নিয়েছেন। ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যতরী

বোঝাই প্রসঙ্গে রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধ, তরণীপূজার বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে মনসামঙ্গলের কাহিনি—

> 'এই দেখ সীমন্ত সিন্দুর। এ সিন্দুরে খরস্রোতা হয়েছিল নদনদী আর বেহুলার মান্দাস চলেছিল ডানা উড়িয়ে। দু-তীরের ত্রয়োতীরা কলস-বুকে ভেসেছিল বহুপথ, বেহুলাকে সঙ্গ দিতে।'[৭]

লেখক তাঁর উপন্যাসে পুনঃনবীকরণ করেছেন মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার। আসলে একবিংশ শতকের উপন্যাসের মাধ্যমে মধ্যযুগের সাহিত্যের স্বাদ পেতে হলে মধ্যযুগীয় পরিবেশ ও কাব্যিক ভাষিক আবহ সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত জরুরি। লেখকের কালিকচেতনার জন্যই বহু অপ্রচলিত ও লুপ্ত বাংলা শব্দ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে—অমরুৎ-পেয়ারা, অলিঞ্জর-বড়ো মৃৎপাত্র, আঙলা-আমলকি, ওদন-অন্ন, ওড়পুষ্প-জবাফুল, কমট-কচ্ছপ, কলাপী-ময়ূর, কুরঙ্গ-হরিণ, কোক-নেকড়ে বাঘ, গড়া-থানকাপড়, গলুই-নৌকার অগ্রভাগ, চিত্রফল-চিতল মাছ, ডাণ্ডিয়া-মাঝি, বদরী-কুল, শকুল-শোল মাছ, শফরী-পুঁটিমাছ, শৃঙ্গাটক-পানিফল, সয়চান-বাজপাখি, ঠমক-বাদ্যবিশেষ, সুভট্ট-বড়ো যোদ্ধা। সেই দুর্বোধ্য ভাষা পড়তে গিয়ে আমাদের খানিকটা হোঁচট খেতে হয়। মধ্যযুগের বাংলা ভাষা নিয়ে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের এহেন গবেষণা প্রশংসনীয় ও মধ্যযুগের ভাষা-সাহিত্য পাঠে অনুপ্রেরণা জোগায়।

৪

অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর-এর জীবনী অবলম্বনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'অমাবস্যার গান' উপন্যাসটি। কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত রচিত ভারতচন্দ্রের কবিজীবনী অবলম্বনে সমকালীন সমাজজীবন ও ব্যক্তি- চৈতন্যের উপলব্ধির অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয়ী অস্থির সময়ের রূপকার হিসাবে ভারতচন্দ্র লিখেছেন 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বহুমুখী সত্যের সম্ভাবনাকে রূপায়ণ করেছেন। ষোড়শ শতকে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদের উদ্যমতা অষ্টাদশ শতকে ছিল না। চারিদিকে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, মিথ্যাচার ভণ্ডামিতে পূর্ণ। বাঙালির মনে কেবলই ভয় কাজ করছিল। সেই ভয় কখনও বর্গি আক্রমণের, কখনও চোর-ডাকাতের। যে জমিদাররা প্রজাদের সুখে-দুঃখে রক্ষা করেছেন, তারাও বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত। রাজকোষ শূন্য, দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এমনই এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ভারতচন্দ্র লিখলেন 'অন্নদামঙ্গল'। এইরকম অন্ধকারময় পরিস্থিতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে 'অমাবস্যা'-রূপে প্রতিভাত হয়েছে। উপন্যাসে রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় দিতে গিয়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকে তুলে এনেছেন। মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে নবাবের পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিত্র কি হতে চলেছে, কৃষ্ণচন্দ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন। সিংহাসনে যেই বসুক না কেন, রাজা শোষণে পিছপা হবেন না। কৃষ্ণনগরের দুর্গোৎসবের মধ্যে ভারতচন্দ্র দেখেছিলেন অন্য এক বাংলাকে। মানুষের ধর্মের প্রতি আস্থা নেই, চোর-ডাকাতের ভয়ে চারিদিক সন্ত্রস্ত। সর্বোপরি চারিদিকে অন্নের জন্য মানুষের হাহাকার।

ভারতচন্দ্র খুব কাছে থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধার্মিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। আবার মহারাজের দেওয়ান সিপাহীরা খাজনা আদায়ের জন্য দরিদ্র প্রজাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। প্রজাদের খাজনাতে কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দী খাঁকে নজরানা দেবেন। রাজবাড়িতে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হবে।

> ''এই সমাজ পটভূমিতে অবস্থান করে ভারতচন্দ্র যে মুকুন্দের মতো বিনম্র ভক্তির কাব্য চণ্ডীমঙ্গল লিখতে পারেন না, তিনি যে সমাজ-সঙ্কট আত্মস্থ করে নূতন মঙ্গলকাব্য লিখবেন, ন্যায়-অন্যায় সংশ্লিষ্ট দার্শনিক জিজ্ঞাসাকেই পরতে পরতে প্রবিষ্ট করাবেন, ভারত-জীবনীকার ঔপন্যাসিক নারায়ণ সেই দিকটিকেই বার বার দেখিয়েছেন।''[৮]

ভাগ্যবিড়ম্বিত ভারতচন্দ্র নিজের যাপিত জীবনের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত জীবনের কোনো মিল খুঁজে পাননি। জীবনকে

উপলব্ধি করে বুঝেছিলেন জীবন কণ্টকময়। জীবনের প্রারম্ভে বর্ধমানের মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে পৈতৃক বিবাদের জেরে তারা সর্বস্বান্ত হন। মামার বাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষা করায়ত্ত করার পর নিজ গৃহে ফিরে এসে অগ্রজেরা সাদর আহ্বান জানাননি। কারণ মুসলিম শাসনকালে দেশের রাজভাষা হল ফারসি। কাজেই ফারসি শিক্ষা লাভ করলে প্রচুর অর্থাগম হবে। এরপর রাজস্ব যথাসময়ে পাঠাতে ব্যর্থ হলে কারারুদ্ধ হন। নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে কটক, শ্রীক্ষেত্রে সন্ন্যাসীবেশে ঘুরে বেড়ান। এভাবেই শৈব ভারতচন্দ্র পরিণত হলেন বৈষ্ণব ভারতচন্দ্রে। সঙ্গী ভৃত্য নাপিত রঘুনাথ। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে তাঁরা খানাকুলের কৃষ্ণনগরে আশ্রয় নেন। ভারতচন্দ্রের শালীপতির বাড়ি সেখানে। রঘুনাথ ভারতচন্দ্রের অজ্ঞাতেই শালীকে খবর দেন। তারা ভারতচন্দ্রকে ধরে নিয়ে এলেন বাড়িতে। সন্ন্যাসী ভারতচন্দ্র আবার গৃহী হলেন। উপলব্ধি করলেন স্ত্রীর বিরহযাপনের দিনগুলি। পিতা ও অগ্রজের জন্য যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাই অগ্রজের ঘরে ফিরতে চাননি। আশ্রয় নিলেন ফরাসডাঙ্গার ফরাসিদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সূত্রেই তিনি পরিচিত হলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করলেন অন্নদামঙ্গল।

ভারতচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন কাব্যরস আস্বাদনের ভোক্তার বড্ড অভাব। তা সত্ত্বেও অন্নদামঙ্গল লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য মহারাজের মনোরঞ্জন করতে পারে না। তাই নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদিরসে ভরপুর বিদ্যাসুন্দর লিখতে হয়। কবি ভারতচন্দ্র উপলব্ধি করেন—

> ‘এদিকে শহরের আলো, ওপারের হেমন্তের শীতল অমাবস্যা। সেই অমাবস্যায় গ্রাম ডুবে আছে, দেশ ডুবে আছে। আর কোন্ অন্ধকার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। সেই আগামী শীতের রাতের জন্যে ভারতচন্দ্র লিখে গেলেন তাঁর বিদ্যাসুন্দর। কবিকঙ্কণের গান হারিয়ে যাবে, অন্নপূর্ণার কথা কেউ শুনতে চাইবে না—কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের গানে সে রাত বিষে আবিল হয়ে উঠবে। সেই বিষপাত্র ভারতচন্দ্রই আজ দেশের মুখে তুলে দিয়ে গেলেন।’’[৯]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে সম্পূর্ণরূপে বিলাসী ছিলেন তা নয়। নবাবী শাসন থেকে ইংরেজ শাসন এই যে কালান্তর ঘটছে বাংলাতে। মানসিক প্রশান্তির জন্যই মনোরঞ্জনের উপকরণরূপে তিনি বেছে নিয়েছেন ‘বিদ্যাসুন্দর’কে। তাই ঔপন্যাসিকের কাছে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু কোনো ব্যক্তির মৃত্যু নয়, একটি যুগের অবসান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র কবি ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনকে তুলে ধরতে চাননি। বরং সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে ভারতচন্দ্রের চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন। তাই বলা যেতে পারে, ‘অমাবস্যার গান’ একজন মঙ্গলকাব্যের কবির জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের পাশাপাশি যুগসন্ধির স্মারকও বটে।

৫

শচীন দাশের ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ বাস্তুহারা মানুষদের নিয়ে লেখা। উপন্যাসের নায়ক ধনপতি। গোবিন্দপুর রেলবস্তি থেকে উৎখাত হয়ে সে নোনাডাঙায় প্লাস্টিকের তাঁবু খাটিয়ে সংসার শুরু করে। পেশায় রংমিস্ত্রি ধনপতি প্রতিনিয়ত হাজারও সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমস্যায় জর্জরিত ধনপতি একসময় উপলব্ধি করে সে পাঁচশো বছর আগেকার মানুষ— ধনপতি সওদাগর। দেশ-দেশান্তরে সে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেত। কিন্তু নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় তার সবকিছু শেষ হয়ে যায়। ধনপতিকে আবার বর্তমানের জীবনে ফিরে আসতে হয়। বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনে লেখক এক অখণ্ড কালকে উপন্যাসে বাঁধতে চেয়েছেন। উপন্যাস পনেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির নামকরণে বিষয় ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ের চিহ্ন রয়েছে—রেলঝুপড়ি থেকে নোনাডাঙা, দশ বাই দশ তাঁবুর ভেতরে ঘর পরিচ্ছেদগুলিতে; আবার গাঙ্গুড়ের পথে, হাটের মাঝে ধনপতি, ধনপতি নৌকাযাত্রা, চম্পকনগরে রাত্রি, চম্পকনগরে ধনপতি প্রভৃতি শিরোনামের মধ্যে অতীতের মঙ্গলকাব্যের ছবি ভেসে

ওঠে। ঔপন্যাসিক শচীন দাস নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ, বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষের লোভ-লালসা ও নদীর স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে যাওয়াকে নিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সভ্যতা ধ্বংস হয়ে মানুষের নিরাশ্রয়ী হওয়া মানুষের দুঃখ-কষ্টকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

ধনপতি সওদাগরের সূত্র ধরেই লেখক তাঁর পাঠককে মঙ্গলকাব্যের জগতে বিচরণ করিয়েছেন। উপন্যাসে ধনপতি, সপ্তগ্রাম, বেহুলা-লখিন্দর, চম্পকনগরের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে মনসামঙ্গল কিংবা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। ধনপতি যেমন চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডকে তেমনি বেহুলা-লখিন্দর, চাঁদ সদাগর মনসামঙ্গলকে স্মরণ করায়। সোনাডাঙ্গার বস্তিতে দীন-দরিদ্র রংমিস্ত্রি ধনপতির সওদাগর হওয়ার মধ্য দিয়ে লেখক অপূর্ব সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যকে নতুনত্ব দিতে গিয়ে লেখক রূপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সাহায্য নিয়েছেন।

ধনপতি দীর্ঘসময় অতীতচারী হলেও তাকে বর্তমান সময়ের কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। সে বারবার নিজের বাসস্থান পরিবর্তন করে। গোবিন্দপুর থেকে নোনাডাঙ্গা হয়ে টালিগঞ্জের রেললাইনের পাশের ঝুপড়িতে সে মাথা গোঁজে। শেষে নিজের ভ্রাম্যমান জীবনে আবিষ্কার করে এক নদী। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সহায়তায় ধনপতি লুপ্ত নদীর কাছে পৌঁছায়। সেই নদী হল গাঙ্গুর। ধনপতি জানতে পারে চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর সর্পঘাতে মারা গেছে। মনসামঙ্গল অনুসরণে লেখক সেই বর্ণনা দিয়েছেন—

> 'বেহুলার জন্য মান্দাস তৈরি হচ্ছে .... কন্যাটি উজানি নগরের সাধু বেনের মেয়ে। চাঁদোবেনের পুত্রবধূ। গত রাত্রে এই কন্যার অজান্তেই কালনাগিনী তাঁর স্বামীকে দংশন করে। অথচ দেখুন, লৌহনির্মিত বাসরঘর! কী করে যে প্রবেশ করল!'[১০]

ঔপন্যাসিক এখানে মনসামঙ্গলের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের কাহিনিকে মিশিয়ে এক নতুন পাঠকৃতি প্রস্তুত করেছেন।

ধনপতি বেহুলার কথা শুনতে পায়। সে শোনে বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ দিতে চাননি চাঁদ। কারণ বেহুলার কপালে অকাল বৈধব্য যোগ রয়েছে। নদীর বুকে চর পড়ায় ধনপতি ব্যবসা-বাণিজ্যে যেতে পারে না। নিজে অসহায় বোধ করে। ধনপতি প্রাচীন বাংলার জনপদ ও ইতিহাস এবং পুরাণের মুখোমুখি হয়। অতীতে বিচরণ করতে গিয়ে সে ধনুক, কিঙ্কিণ, আলোমোহনদের সাক্ষাৎ পায়। তারা উপলব্ধি করে গাঙুড় নদীর স্রোত হারিয়েছে। কলার মান্দাস ছিল বলে বেহুলা তার স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে গাঙুড়ের জলে ভাসতে পেরেছিল। বড় নৌকা নদীতে প্রবেশ করতে পারে না। ধনপতি দক্ষিণদ্বারে এক কৃষকের মুখ থেকে জানতে পারে ধনপতি নামের এক বণিক বাণিজ্যে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তার দেহখানি ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। দুই সঙ্গীকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধনপতির স্ত্রী সন্ন্যাসিনী হয়েছে।

উপন্যাসে লেখকের পুরাণ ভাবনার সঙ্গে পরিবেশ ভাবনা মিশে গেছে। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন—

> "শচীন দাশের এই উপন্যাসটির নির্মাণ কলায় আছে অভিনব এক আঙ্গিক। সেই প্রকরণে মিশেছে মিথ অর্থাৎ পুরাকথা, লোকপুরাণ এবং রূপকথা। এবং মিশ্রিত স্থাপত্য দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এই মুহূর্তের বাস্তবতায় বিদীর্ণ মৃত্তিকায়।"[১১]

মানুষের জীবনযাত্রায় নদীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে ধনপতি। তাই সে লুপ্ত নদীর সন্ধানে বেরিয়ে লক্ষ করে নদী আর নেই। চম্পকনগরে এসে বুঝতে পারে—কেবল গাঙ্গুর নয়, বেহুলা, বুড়ো দামোদর ... কুন্তী সব নদীই মৃত্যুর পথে—নদীতীরের জনপদও তাই শূন্য হয়ে যাচ্ছে—কৃষিকার্যও পূর্বের ন্যায় হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষণও ভালো নয়।[১২] এই দুরবস্থার মধ্যে দেশে পর্তুগিজ জলদস্যুদের আগমন ঘটেছে। সওদাগরেরা স্থান পরিবর্তন করেছে। গড়ে উঠেছে নতুন শহর কলকাতা। নদী প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে এককালে সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে

গেছে। তাই সে নদীর বালি সরিয়ে সরিয়ে লুপ্ত ইতিহাস খুঁজতে থাকে। এইভাবে কথাকার শচীন দাস মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গে বাংলার সমৃদ্ধময় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানে নদীকেন্দ্রিক পরিবেশ-সংকটকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

৬

জাতির উপরে জাতির বিজয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন শাসক শাসিতের সংস্কৃতি চেতনার উপর দখল নেওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসকের প্রথম লক্ষ ছিল উপনিবেশিত মানুষের মনোজগতে আধিপত্য কায়েম করা। উপনিবেশিত মানুষদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দেওয়া যে পাশ্চাত্যের সবকিছুই উন্নত। দেশীয় মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে নিজেদের গোষ্ঠী, সংস্কৃতি, চিন্তাচেতনা—সবই পাশ্চাত্য শাসকের চেয়ে নিকৃষ্ট। ইংরেজ শাসকরা তাদের পরিত্রাতা। ঔপনিবেশিক শাসন দেশীয় মানুষদের নিজেদের ঐতিহ্যকে ঘৃণা করতে শেখায়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে দারুণভাবে ভারতীয়দের ইংরেজ-অনুকরণকে চিত্রিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের স্বার্থবুদ্ধির জন্য বহু বিজিত দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে কলোনি শাসনের অবসান হলেও কলোনিয়াল হ্যাংওভার আজও রয়ে গেছে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার আলোয় সাহিত্যলোক উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু এই 'আধুনিকতা' যতই আমাদের উপর চেপে বসতে লাগল, ততই যেন আমরা মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলাম। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> "আমরা বর্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে বাংলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরেজি, লিখি বাংলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরেজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই মেঘনাদবধকাব্য পরগাছার ফুল। 'অর্কিড'-এর মতো তার আকারের অপূর্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য .... যতই ক্ষীণ হোক-না কেন, প্রাণও আছে গন্ধও আছে।"[১৩]

একবারও মনে হয়নি দেশীয় উপাদান সহযোগে উপন্যাসের মত বৃহৎশিল্প সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই সংস্কৃতি বিমুখতা শিকড়হীনতারই নামান্তর। অধ্যাপক জহর সেনমজুমদার লিখেছেন—

> "আত্মসামাজিক জীবনচেতনার ইতিহাসে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কহীনতায় ভুগতে ভুগতে মানুষ ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার মূল্যবোধেই তখন ক্রমশ রপ্ত হয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত ভোগস্পৃহাতেই আচ্ছন্ন। যৌথ জীবনচেতনার মধ্যে একদা যেসব লোককাহিনী ও লোকপুরাণের জন্ম হয়েছিল, তা থেকে বহুদূরে সরে মানুষ জীবন-অন্বেষাকেই কার্যত পরিত্যাগ করে বসেছে। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত সুলভ ইনটেলেকচুয়ালিজ নয়, প্রয়োজন ছিল আত্মসংস্কৃতির অপরাজেয় পুনর্নির্মাণ।"[১৪]

একালের লেখক-কথাসাহিত্যিকদের রচনায় ফিরে এসেছে মধ্যযুগের কাব্যঐতিহ্য। আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে যেমন মঙ্গলকাব্য প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনই লেখকদের সমকালীন সমাজ অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিবোধের স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১. কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১২৯২, পৃ. ৭৭।

২. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, মাঘ ১৪১৯, পৃ. ১১৬-১১৭।
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১২।
৪. অমলেন্দু চক্রবর্তী, চাঁদ মনসার জোট, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫০।
৫. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলসূত্র : বঙ্গের অঙ্গভূষণ, বিমলকুমার থান্দার সম্পাদিত, বাংলা মঙ্গলকাব্য ও তার উত্তরাধিকার, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. v।
৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩৪।
৭. তদেব, পৃ. ৩১।
৮. প্রসূন ঘোষ, আধুনিক উপন্যাসে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য : অন্বেষণ ও পর্যালোচনা, তাপস ভৌমিক সম্পাদিত মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্য চর্চা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদ ২০১৬, পৃ. ৩৬৪।
৯. অমাবস্যার গান, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় : সবিতেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২৪, পৃ. ৯০।
১০. শচীন দাশ, নদী তরঙ্গের আয়না, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২০।
১১. সুমিতা চক্রবর্তী, শচীন দাশের একটি উপন্যাস ও লোকপুরাণ, শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃ. ৫২৬।
১২. শচীন দাশ, নদী তরঙ্গের আয়না, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৪৩।
১৩. প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্রের মুখপত্র, প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৫।
১৪. জহর সেন মজুমদার, মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল : নির্মাণ ও বিনির্মাণ, বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৫৬৭।

সুনির্মল বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

সখের থিয়েটারে পুরুষ অভিনেতাদের স্ত্রী-চরিত্রাভিনয়

ধ্রুবজ্যোতি পাল

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি নিজস্ব বাড়িতে নাট্যশালা স্থাপন করে বাংলা নাটকের অভিনয় করতে থাকেন। এই ধরনের থিয়েটার বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সখের মঞ্চ বা সখের নাট্যশালা নামে পরিচিত। নবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগের পর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আবার বাংলা নাট্যাভিনয়ের ধারা লক্ষ করা যায় এবং তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এই থিয়েটারে অভিনেত্রীরা ব্রাত্য ছিলেন। ফলে নায়িকা ও অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রাভিনয়ে পুরুষদেরই ফিমেল অ্যাকট্রেসদের কাজ সম্পন্ন করতে হতো। কমবয়সী ছেলেরা মেয়ে সেজে গোঁফ কামিয়ে বামাস্বরের নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট) আগে পর্যন্ত এই রীতি চলে আসছিল। বহু অভিনেতা এই নারীচরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, অভিনেতারা তাঁদের নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। সে-কারণে সংশ্লিষ্ট অভিনেতাদের অন্য থিয়েটারে প্রায় দেখাই যেত না। পৃষ্ঠপোষকের অনীহায়, আর্থিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে থিয়েটার উঠে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের অভিনয় জীবন শেষ হয়ে যেত। যত নতুন নতুন সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে নতুন অভিনেতা-গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। আবার থিয়েটার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হারিয়েও গেছেন। কেউ একরাত্রি, দুরাত্রি বা কয়েকরাত্রি অভিনয় করেছেন। তাঁদের সেই অভিনয়ের স্মৃতি ধরা আছে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথায়, সমকালীন সংবাদপত্রের পাতায়। পুরুষ চরিত্রাভিনেতাদের বর্ণনার প্রাধান্য সেখানে থাকলেও নারীচরিত্র রূপায়ণে যে পুরুষেরা নারী সাজতেন তাঁদের অভিনয়ও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁদের অভিনয় দর্শকদেরও মুগ্ধ করত, মোহিত করত। সেই রকম কয়েকজন উল্লেখযোগ্য স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা হলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মদনমোহন বর্ম্মন/খোট্টা, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রমুখ।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকটি (নন্দকুমার রায় রচিত) প্রথম অভিনীত হয় আশুতোষ দেবের বাড়ির নাট্যশালায়। অভিনয় হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি। নাটকটি আরো কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতেন তা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়।[১] এই নাটকে স্ত্রী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

শকুন্তলা — শরৎচন্দ্র ঘোষ
অনুসূয়া — অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
প্রিয়ম্বদা — ভুবনমোহন ঘোষ

শরৎচন্দ্র ঘোষ (১৮৩৪-১৮৮০) সখের নাট্যশালার বিকাশ পর্বে নারীচরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। শকুন্তলা চরিত্রে তিনি সু-অভিনয় করেন। শকুন্তলার মনোহারিণী রূপ-লাবণ্যে, ভাবভঙ্গিতে এবং সাবলীল অভিনয়ে দর্শক মোহিত হয়ে 'চমৎকার-চমৎকার' বলে এই অভিনয়কে অভিনন্দন জানিয়েছিল।[২] শকুন্তলার অভিনয় সত্যই রাণীর মতো হয়েছিল।[৩] বিশেষত—

পাল, ধ্রুবজ্যোতি : সখের থিয়েটারে পুরুষ অভিনেতাদের স্ত্রী-চরিত্রাভিনয়
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 20-27, ISSN 2249-4332

> ''যখন স্টেজের উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল।''[৪]

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ও প্রশংসিত হয়। এই অভিনয়েও শরৎচন্দ্র ঘোষ শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শকুন্তলার লাবণ্যজ্যোতিতে রঙ্গস্থল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুমিষ্ট স্বরে মধু বর্ষিত হয়েছিল। যার ফলে তাঁর অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। তাঁর আনন্দে সকলে আনন্দিত, তাঁর ম্লান বদন-দর্শনে সকলে ম্লানমুখ এবং তাঁর কাতরোক্তি শ্রবণে অনেকে অশ্রুপাত করেছিল।[৫] তাঁর এই অভিনয় ছিল অপূর্ব। দর্শকগণ তাঁর অভিনয়ে প্রীত হয়েছিল। দুটি অপ্রধান নারীচরিত্র অভিনয়ে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ও ভুবনমোহন ঘোষ ছিলেন সাবলীল।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক অভিনয়ের পর রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় কলকাতার নতুন বাজারের রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়, তার উল্লেখ করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় সে-অভিনয়ের খবর প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে। বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সে-অভিনয় হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সেই অভিনয়ে মেয়েদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। মেয়েদের ভূমিকাগুলি পুরুষেরা সম্পন্ন করে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় একটি স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকটি মোট চারবার অভিনীত হয়। দ্বিতীয় অভিনয় হয় রামজয় বসাকের বাড়িতেই। তৃতীয় অভিনয় হয় বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাড়িতে (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ) এবং চতুর্থ অভিনয় হয় চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের বাড়িতে (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই)। বলাবাহুল্য কোনো অভিনয়েই নারীরা অংশগ্রহণ করেননি। নারী ভূমিকাগুলি পুরুষ অভিনেতারাই গ্রহণ করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ভট্টনারায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'বেণীসংহার' নাটকটি অভিনীত হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল। এই নাটকের অভিনয় বিশেষভাবে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই অভিনয়-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকর' (১৫ এপ্রিল ১৮৫৭) পত্রিকায়। দুর্যোধন-পত্নী ভানুমতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বিশেষ কুশলতা দেখান।

> ''দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stage-এর উপরে ঝল-মল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, জানি না।''[৬]

'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকাতেও জানানো হয়েছিল যে, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ''বেণীসংহার নাটকের অভিনয়কালীন দুর্য্যোধন সীমন্তিনী হইয়াও যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হন।''[৭] কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন যে, ভানুমতীর চরিত্রে অভিনয় করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি লিখেছেন—

> ''We have heard from reliable sources that Kali Prossunno who represented the part of Princess Bhanumati played it to perfection, and was welcomed with roars of applause when he appeared before the admiring gaze of the audience as a beautiful girl dressed in a rich gold-embroidered Banares Sari and decked with priceless jewels which belonged to his family and which excited the envy of the richest men in Calcutta.''[৮]

যাইহোক ভানুমতী চরিত্রে যিনিই অভিনয় করুন না কেন সে-অভিনয় চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

মণিমোহন সরকার রচিত 'মহাশ্বেতা' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর আশুতোষ দেবের বাড়ির নাট্যশালাতে। নাটকটির ভূমিকা অংশ থেকে জানা যায় কে কোন্ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নারী ভূমিকাগুলি

গ্রহণ করেছিলেন—

মহাশ্বেতা — ক্ষেত্রমোহন সিংহ
কাদম্বরী — মহেন্দ্রনাথ ঘোষ
তরলিকা — শরৎচন্দ্র ঘোষ
রাণী — ভুবনমোহন ঘোষ
ছত্রধারিণী — মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কঞ্চুকী — শিবচাঁদ সিংহ

এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) পত্রিকায়। মহাশ্বেতা, কাদম্বরী ও তরলিকার অভিনয় ভালো হয়েছিল বলে জানানো হয়। বিশেষ করে কাদম্বরী চরিত্রে মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন অনবদ্য।

> "মহাশ্বেতা তরলিকা ও কপিঞ্জল আপন আপন ভাব প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষ রূপে কাদম্বরীর প্রশংসা করিতে হয়। .... কাদম্বরীর ভার যাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তিনি বালক। কিন্তু বালক হইয়াও স্বীয় ভার এরূপ মর্য্যাদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছেন যে দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"[৯]

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নারীচরিত্র অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এর আগে তিনি 'বেণীসংহার' নাটকে ভানুমতী চরিত্রে অভিনয় করেন এবং বিশেষ প্রশংসিতও হন। শরৎচন্দ্র ঘোষও ছিলেন দক্ষ অভিনেতা। তিনি এর আগে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে শকুন্তলা চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের চমৎকৃত করেছিলেন। স্কুল শিক্ষক ভুবনমোহন ঘোষ 'মহাশ্বেতা' নাটকে রাণী চরিত্রে অভিনয় করেন। পূর্বে তিনি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে প্রিয়ম্বদা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নায়িকা মহাশ্বেতা চরিত্রে অভিনয় করে ক্ষেত্রমোহন সিংহও প্রশংসিত হন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই। এই অভিনয়ের জন্য প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ হয়। নাটকটি ছয়-সাত বার অভিনীত হয়। বলাবাহুল্য, অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই নাটকের প্রথম অভিনয় সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' (৪ আগস্ট ১৮৫৮, বুধবার) ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার) পত্রিকায়। প্রথম অভিনয়ে স্ত্রী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন[১০]—

রত্নাবলী — হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাসবদত্তা — মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী
সুসঙ্গতা — অঘোরচন্দ্র দিঘরিয়া
নটী — রমানাথ সাহা
নর্তকী — কালিদাস সান্যাল, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কাঞ্চনমালা — শ্রীরামপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ।

এই নাটকের অনেক অভিনেতা ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত। অভিনয়-কলা সম্বন্ধে তাদের বেশ জ্ঞানও ছিল। রত্নাবলীর ভূমিকায় হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের ভালো লাগে। নটীর ভূমিকার রমানাথ সাহা এবং নর্তকীর ভূমিকায় কালিদাস সান্যাল ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকরা বিশেষ উপভোগ করে। তাঁদের নৃত্য ও গীত চমৎকার হয়েছিল।[১১]

উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল মেট্রোপলিটান থিয়েটারে। চিৎপুরের সিঁদুরিয়াপট্টিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রথম অভিনয়ে নারী-ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন[১২]—

সুলোচনা — বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

সুখময়ীর মা — গোপালচন্দ্র সেন

রসবতী নাপিতানী — রাখালচন্দ্র সেন

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে (জয়রাম বসাকের বাড়িতে, ১৮৫৭) জনৈকা স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। 'বিধবাবিবাহ' নাটকে তিনি সুলোচনা চরিত্রে অভিনয় করেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[১৩] সমকালীন পত্রিকায় এই অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। মহিলা চরিত্রগুলির মধ্যে সুখময়ীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।[১৪]

'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি এখানে প্রথম অভিনীত হয়। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বন্ধু গৌরদাস বসাককে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ একটি পত্রে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনেতাদের নামের উল্লেখ করেছেন।[১৫] সেখান থেকে জানা যায় কে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নারী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

শর্মিষ্ঠা — কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবযানী — হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পূর্ণিকা — কালিদাস সান্যাল

দেবিকা — অঘোরচন্দ্র দিঘরিয়া

নটী — চুনিলাল বসু

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ভূমিকায় যথাক্রমে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর আগে 'রত্নাবলী' নাটকে রত্নাবলী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'new comer' হলেও তাঁর অভিনয় দর্শককে প্রীত করেছিল। তিনি পরে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে (পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়-এ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) হীরা চরিত্রে অভিনয় করেন। মধুসূদন স্বয়ং বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

> "When Sharmistha was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Evan the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings they were 'things to dream of, not to tell'."[১৬]

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই। রাধাকান্ত দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। স্ত্রীভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

হরকামিনী — কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ

প্রসন্নময়ী — কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ

নৃত্যকালী — গোপালচন্দ্র রক্ষিত

এই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। দর্শকগণ মুক্তকণ্ঠে অভিনেতাদের সাধুবাদ জানিয়েছিল। স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণের অভিনয় দর্শকদের মোহিত করেছিল।

> "নববাবুর স্ত্রী হরকামিনীর মনোহর লাবণ্যে, সুমধুর স্বরে ও হৃদয়ভেদী বিলাপে উপস্থিত দর্শকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিল। নায়িকাদিগের মধ্যে হরকামিনীই বিশেষ প্রশংসাপাত্রী হইয়াছেন।"[১৭]

তাছাড়া গৃহিনী কমলা ও নর্তকীদের অভিনয় বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ভারতচন্দ্র রায়ের কাহিনী অনুসরণে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাট্যায়িত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের উল্লেখযোগ্য মঞ্চাভিনয় হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর। এর আগে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালাতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয় ১৮৩৫-এর ৬ অক্টোবর এবং স্ত্রী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেন অভিনেত্রীরাই। কিন্তু পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে স্ত্রী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন পুরুষ অভিনেতারা। তাঁরা নারী সেজে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ'-এ 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন। নারী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

বিদ্যা — মদনমোহন বর্মন/খোট্টা

হীরা (মালিনী) — কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুলোচনা (রাজকন্যার দাসী) — ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়

চপলা (রাজকন্যার দাসী) — যদুনাথ ঘোষ, পরে ফটিকচন্দ্র (হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

বিমলা (চপলার সই) — নারায়ণগঞ্জের বসাক

'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে যাঁরা নারীচরিত্র গ্রহণ করেন তাঁরা অধিকাংশ ছিলেন কমবয়সী ও নবাগত। একমাত্র কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে শর্মিষ্ঠা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যাইহোক এই অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল এবং নারী চরিত্রাভিনেতাদের অভিনয়ও ভালো হয়েছিল।[১৮]

'নবনাটক' নাটকটি জোড়াসাঁকো থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। মহিলা ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

সাবিত্রী (গবেশবাবুর বড়ো স্ত্রী) — সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

চন্দ্রলেখা (গবেশবাবুর ছোটো স্ত্রী) — অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অচলা — থাকভূষণ মুখোপাধ্যায়

কমলা — দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিমলা — রাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায়

চপলা — হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রকলা — মতিলাল মুখোপাধ্যায়

সাধী — রামগোপাল মজুমদার

নটী — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতি' থেকে এই নাটকের ভূমিকালিপি ও যাঁরা অভিনয় করেন তার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যাঁরা স্ত্রী ভূমিকাগুলি নিয়েছিলেন অভিনয়ের ঠিক পূর্বে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শকমণ্ডলীর সামনে অভিনয় করার ভয়ে ঘন ঘন মূর্ছাও গিয়েছিলেন। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (গবেশবাবুর বড়ো স্ত্রী) ও অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (গবেশবাবুর ছোটো স্ত্রী) অভিনয় ছিল সাবলীল। অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটোগিন্নির ভূমিকায় যখন আর্শির সামনে বসে প্রসাধন করতেন ও যৌবন-গর্বে গর্বিতা রূপসীর হাবভাবের অভিনয় করতেন তখন সে-অভিনয়ে দর্শকরা খুব আনন্দ পেতেন। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বড়ো স্ত্রীর ভূমিকায় সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ হয়ে যখন মর্মভেদী আক্ষেপোক্তি করতেন তখন দর্শকবৃন্দ বাস্তবিক অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হলে অমলা কমলা চন্দ্রকলা প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ মড়াকান্না জুড়ে দিত। সেই কান্না শুনে পাড়ার লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন।[১৯]

'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকটি শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে অভিনয়

হয়েছিল। অভিনয়ের তারিখ ছিল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে। নারী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

কৃষ্ণকুমারী — কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ
অহল্যাবাই — কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ
তপস্বিনী — শ্রী উদয়কৃষ্ণ দেব
বিলাসবতী — বাবু হরলাল সেন
মদনিকা — বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী — শ্রী হরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী — বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মদনিকা চরিত্রে রামকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ও কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ এর আগেই 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে অভিনয় করেন। তাঁরা এই নাটকে ভালো অভিনয় করেন। সমকালীন পত্রিকায় এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা লক্ষ করা যায়।[২০]

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসনের অভিনয় হয়েছিল বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে (শ্যামবাজার নাট্যসমাজ) ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সপ্তমী পুজোর দিন। বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের সদস্যরা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে থিয়েটার করতে উৎসাহী হলে গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরামর্শে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করা হবে বলে স্থির হয়। রাধামাধব করের স্মৃতিকথা থেকে এই প্রহসনের ভূমিকালিপি জানা যায়।[২১] নারী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেন—

কাঞ্চন — রাধামাধব কর
কুমুদিনী — আপালচন্দ্র বিশ্বাস
সৌদামিনী — মহেন্দ্রনাথ দাস
নটী — নগেন্দ্রনাথ পাল

পরবর্তী কালের বিখ্যাত অভিনেতা রাধামাধব কর এই প্রহসনে কাঞ্চনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সামগ্রিকভাবে অভিনয় তেমন ভালো হয়নি। তবে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে এই অভিনয় তথা থিয়েটারের একটি ভূমিকা আছে। সেদিক থেকে এই অভিনয়ের গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

এই থিয়েটারে (পরে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ) 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে তারিখে। এই অভিনয় হয়েছিল শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে। অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত হয়েছিল যে পরবর্তী অভিনয় দেখার জন্য দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার হয়েছিল। রাধামাধব করের স্মৃতিকথা থেকে এই নাটকের ভূমিকালিপি জানা যায়।[২২] স্ত্রী ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিলেন—

লীলাবতী — সুরেশচন্দ্র মিত্র
ক্ষীরোদবাসিনী — রাধামাধব কর
শারদাসুন্দরী — অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
রাজলক্ষ্মী — ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ঝি — অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি

সমকালীন পত্রিকায় এই অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা লক্ষ করা যায়। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১৬ আষাঢ় 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায় যে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে লীলাবতী ও

শারদাসুন্দরীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসাভাজন হয়েছিল। লীলাবতীর অভিনয় যদিও অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তা লীলাবতী-রূপী সুরেশচন্দ্র মিত্র দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেন। ক্ষীরোদবাসিনীর অভিনয়ে রাধামাধব করের বিলাপ এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হয়েছিল যে তা শুনে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের হৃদয় আর্দ্র হয়েছিল।[২৩] 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকাতেও লীলাবতী শারদাসুন্দরী ও ক্ষীরোদবাসিনীর অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়।[২৪] তাছাড়া ঝি-এর অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির মুখে খাঁটি মেদিনীপুরের ভাষা শুনে সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে মহিলা চরিত্রগুলির অভিনয় খুব ভালো হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সখের থিয়েটারে অভিনয় শুরু হয়েছিল আশুতোষ দেবের বাড়ির নাট্যশালায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দিয়ে। দীর্ঘ পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে কলকাতা ও মফস্বলের ধনী নাট্যরসিকদের নাট্যশালায় বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। একই নাটক একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল জনপ্রিয়তার কারণে বা দর্শকদের অনুরোধে। সখের থিয়েটারে আমরা যেমন নতুন নতুন নাট্যমঞ্চের আবির্ভাব লক্ষ করি তেমনি সেই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে বহু নতুন অভিনেতাদেরও লক্ষ করি। সুদর্শন কম বয়সী অভিনেতারা স্ত্রীচরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হতেন। তাঁরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে দক্ষ অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এই সময়ে সামাজিক কারণে পতিতা নারীদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয়নি। যদিও অনেক সময় নারীদের দিয়ে নারীচরিত্রে অভিনয় করানোর দাবি উঠেছিল কিন্তু সে-দাবি বা প্রস্তাব সখের থিয়েটারে গৃহীত হয়নি। সে-কারণে নায়িকা ও অন্যান্য স্ত্রীচরিত্রে অনিবার্যভাবে পুরুষদেরই অভিনয় করতে হয়েছিল। অপ্রধান ও ছোটো ছোটো স্ত্রী ভূমিকাগুলি যাঁরা গ্রহণ করতেন তাঁদের অভিনয়ও দর্শক উপভোগ করতেন। সখের থিয়েটারে পুরুষরা নারী সেজে অভিনয় করবেন—এটিই রীতিতে পরিণত হয়েছিল। নারী চরিত্রাভিনয়ে ওই সমস্ত অভিনেতাদের নারীবেশ ধারণে চলন ও কথনে অবিকল নারীরই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ত। নারীদের স্বভাব হাবভাব যথাযথ আয়ত্ত করে অভিনয়ে তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অভিনয়ের সময় বোঝা যেত না যে তাঁরা প্রকৃত নারী নন। সে-কারণে স্ত্রীচরিত্রে পুরুষদের নারী সেজে অভিনয় বিসদৃশ লাগত না। বরং তাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এজন্য তাঁরা বাংলা রঙ্গালয়ে যথার্থ মর্যাদায় আসীন হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র

১. পুরাতন প্রসঙ্গ — বিপিনবিহারী গুপ্ত (মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা), প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৫৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৭৯-৮০।

২. সমাচারচন্দ্রিকা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

৩. হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

৪. পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত (মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা), ঐ, পৃ. ৭৯।

৫. সংবাদ প্রভাকর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

৬. পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত (মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা), ঐ, পৃ. ৮০-৮১।

৭. সাপ্তাহিক বার্তাবহ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭, দ্র. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ষ্ঠ সং অগ্রহায়ণ ১৩৯৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৪০।

৮. Memories of Kali Prossunno Singh, Manmathanath Ghosh, 1920, Published by Barendra Nath Ghosh, Barendra Library, 204 Cornwallis Street, Calcutta, P. 28।

৯. সাপ্তাহিক বার্তাবহ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭।

১০. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৪৫, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, কলকাতা, পৃ. ১৭।

১১. হিন্দু পেট্রিয়ট, ৫ আগস্ট ১৮৫৮।

১২. বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা (১ম খণ্ড), দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ২১৬।
১৩. বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, অজিতকুমার ঘোষ, ২য় সং, এপ্রিল ১৯৯৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১১০।
১৪. বেঙ্গল হরকরা, ২৭ এপ্রিল ১৮৫৯।
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ষ্ঠ সং অগ্রহায়ণ ১৩৯৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৫০।
১৬. মধুসূদন রচনাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৯০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (চিঠি নং ৫৮, তারিখ ১ জুলাই ১৮৬০) পৃ. ৫৪৯।
১৭. সংবাদ প্রভাকর, ৩ আগস্ট ১৯৬৫।
১৮. সংবাদ প্রভাকর, ৩ জানুয়ারি ১৮৬৬।
১৯. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২য় সুবর্ণরেখা সংস্করণ ১৪১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৭-৩৯।
২০. হিন্দু পেট্রিয়ট, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।
২১. পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, (রাধামাধব করের স্মৃতিকথা), ঐ, পৃ. ২৫০।
২২. পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, (রাধামাধব করের স্মৃতিকথা), ঐ, পৃ. ২৫৬।
২৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৮৮।
২৪. এডুকেশন গেজেট, ২৪ মে ১৮৭২।

ধ্রুবজ্যোতি পাল,
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটকের (নির্বাচিত) বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য

ঈশিতা মণ্ডল

মনোজ মিত্রের নাটকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'চাকভাঙা মধু'-আমাদের পাঠ্য ছিল। তাঁর নাটকের ভাষা-বিষয়-আঙ্গিকের প্রতি আকর্ষণের শুরু সেই থেকে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে মানুষটিকে একদম কাছে থেকে দেখা ও কথা বলার সৌভাগ্য হয়। শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কী অসাধারণ প্রাণশক্তি! প্রতি মুহূর্তে তিনি উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এখনও মঞ্চে অভিনয় করেন। শেকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার যন্ত্রণায় তাড়িত হন তিনি। নাটকে উঠে আসে প্রান্তিক মানুষের কথা, পুরাণের নবনির্মাণ, সমসাময়িক মানুষের কথা। সময়ের দলিল হয়ে থাকে তাঁর নাটক। কৌতুকের মোড়কে সিরিয়াস বিষয় পরিবেশন করেন। 'নরকগুলজার'-পড়তে গিয়ে দমফাটা হাসি যেমন আসে, তেমনি ক্ষমতাহীন দুর্বল মানুষের করুণ পরিণতিও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। নাটকের পরিণতি মানুষকে নিরাশ করে না। মানুষকে হাসাতে খুব ভালোবাসেন। নাটকের চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন বাস্তব উপযোগী করে। 'সাজানো বাগান' নামের সঙ্গে মনোজ মিত্র জড়িয়ে গেছেন। গান, নামকরণ, দৃশ্য, শব্দপ্রয়োগ, ভাষা তাঁর নাটকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। স্কুল জীবন থেকেই থিয়েটারে অভিনয় পর্ব শুরু হয়। মঞ্চের অভিনয়কে প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত করতে চাইতেন তিনি। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াকালীন থিয়েটারের প্রতি আরও আকর্ষণ অনুভব করেন।

প্রথম নাটক লেখেন 'মৃত্যুর চোখের জল'। রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন তিনি। সাম্প্রদায়িক বিষ, রাজনীতির করাল গ্রাসে ছিন্নমূল হতে হয়। নগর জীবনের জটিলতা তাঁকে সেভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। দেশ-কাল-সমাজের বাস্তব চিত্র তাঁর নাটকে ঘুরে ফিরে এসেছে। গভীর দুঃখের মাঝেও তিনি কৌতুক করার ক্ষমতা রাখেন। দেশজ ঐতিহ্যই তাঁর নাটকের বিষয়। বিদেশি নাটককারদের দ্বারা তিনি সেভাবে প্রভাবিত হননি। আমরা তাঁর একবিংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকটি নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে কথা বলব— 'বনজোছনা' (২০০৬), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২), 'রূপের আড়ালে' (২০০৬), 'মঞ্চে চিত্রে' (১৯৮৫)। দেখব নাটকগুলির নির্মাণশৈলী। একবিংশ শতক কীভাবে উঠে আসছে তাঁর লেখায়।

নাটক আমাদের নতুন দিক দেখায়। রিফ্রেশ করে আমাদের মনকে। সমাজ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। সবার পক্ষে মঞ্চে গিয়ে নাটকের অভিনয় দেখা সম্ভব হয় না। নানান প্রতিকূল অবস্থা থাকে। তাই আমরা নাটক পাঠ করে কিছুটা আস্বাদ নিতে পারি। কারণ শিল্পী সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। আমরা মনোজ মিত্রের নির্বাচিত নাটকগুলির বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য খুঁজে দেখার চেষ্টা করব এখানে।

মনোজ মিত্রের নাট্যগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মধ্যবিত্ত সমাজ। যে সমাজে অর্থসংকট প্রবল। তিনি ভেবে রাখেন কীভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃশ্যগুলি নির্মাণ করবেন। মনোজ মিত্র নাটকের গঠনে আশ্রয় নিয়েছেন পুরাণ, লোকায়ত আঙ্গিক, প্রতীক, রূপকথা ইত্যাদি। ১৯৩৮ সালে ২২শে ডিসেম্বর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর গ্রামে মনোজ মিত্রের জন্ম। সাতক্ষীরা অঞ্চল, কপোতাক্ষ, ভৈরব, বেত্রবতী নদীতীরে শৈশব অতিবাহিত হয় নাটককারের। পিতা অশোককুমার মিত্র উঁচু পদে চাকরি করতেন, বদলি হত মাঝে মাঝে। পিতার বদলির সূত্রেই পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ঘোরা হয়ে যায় লেখকের। চোখের সামনে দেখেছেন বৃহৎ বঙ্গদেশকে ভাগ হতে। জন্মভিটে পাকিস্তানে চলে যায়। খুলনা, ময়মনসিংহ জেলার সহজ সরল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে মনোজ

মণ্ডল, ঈশিতা : মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটকের (নির্বাচিত) বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 28-35, ISSN 2249-4332

মিত্রের শৈশব কাটে। হিন্দু-মুসলমান বাঙালির মধ্যে আত্মিক যোগ ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। পৈত্রিক ভিটেতে দুর্গাপূজা হত, হিন্দু-মুসলিম পরিবার সবার উদ্যোগে। বাড়ির সব সদস্যদের থিয়েটার দেখার অধিকার ছিল না। বিশেষ করে বাড়ির ছোটদের। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ প্রবল থাকে, এটাই স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালে 'রামের সুমতি'-নাটক দেখার সুযোগ হয় মনোজ মিত্রের। রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা'-নাটকে হারাধনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। মনোজ মিত্রের ইচ্ছে ছিল অভিনয় যতটা পারা যায় জীবন্ত করে জনমানসে উপস্থাপিত করা। জামার ভেতরে তিনি জ্যান্ত হাঁস বেঁধে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

সাম্প্রদায়িক বিষ, রাজনীতির করালগ্রাস তাঁদের ছিন্নমূল করে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নাটককার জন্মভিটেতে ছিলেন। তারপর ছিন্নমূল হয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু। নগরজীবন কখনোই আকর্ষণ করতে পারেনি তাঁকে। গ্রাম তাঁর অস্থিমজ্জায় রয়েছে। স্কুলজীবন থেকেই থিয়েটারে অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে অভিনয়কে আরও জীবন্ত রূপ দান করতে চেয়েছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ আরও প্রবল হয়। প্রথম একাঙ্ক নাটক লিখলেন ১৯৫৮ সালে 'মৃত্যুর চোখে জল'। 'ঋতায়ন' নামে নতুন নাট্যদল গড়ে তোলেন। ১৯৭৫ সাল থেকে মনোজ মিত্রের নেতৃত্বে 'সুন্দরম্'-নাট্যদলের নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যুক্ত হন তিনি। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাহচর্য পান। মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানব সভ্যতা কোন দিকে যাচ্ছে এই প্রশ্নগুলি তিনি পাঠক, দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। খুলনার কৌতুকের ঢং তিনি অনুসরণ করেন। তাঁর মতে খুলনার মানুষরা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও রসিকতা পছন্দ করেন। মনোজ মিত্রের সময়কালে নাটক লিখেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার প্রমুখ। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' সাড়া জাগানো নাটক। যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নীল রঙের ঘোড়া', 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'। কিমিতিবাদ, অ্যাবসার্ড প্রভৃতি নাট্যরীতি গড়ে ওঠে এসময়। ষাটের দশক ভারত-চীন যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণে উত্তাল। সত্তরের দশক নকশাল ও মার্কসবাদী চিন্তার আলোড়ন। সত্তরের দশকে মনোজ মিত্রের নাটক 'চাকভাঙা মধু' (১৯৭১), 'নরকগুলজার' (১৯৭৪), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-১৯৭৭), 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯)। উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড'-নাটক লেখেন। কলকাতা শহরেই কার্ফু জারি প্রভৃতি নানান ঘটনা ঘটছিল এই সময়। 'সাজানো বাগান', 'চাকভাঙা মধু'-নামকরণে প্রকৃতি প্রেমিক সত্তার আভাস পাওয়া যায় নাটককারের। সবুজ প্রকৃতিকে নস্যাৎ করতে চাইছেন সুবিধাভোগী মানুষ। সবকিছু আত্মসাৎ করতে চাইছেন সুবিধাভোগী শ্রেণি। প্রোমোটার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আধুনিক হওয়ার নামে যথেচ্ছাচার চলছে চারিদিকে। যার ফল হাতেনাতে পাচ্ছে মানুষ। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার বিপক্ষে কলম ধরেন লেখক। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা'-প্রভৃতি নাটকে যন্ত্র ও মানব সভ্যতার দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই। আত্মস্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে'। তাঁর ভাই অমর মিত্রের স্মৃতিচারণাও আছে বইটিতে। শৈশবের ঘটনা এখানে রয়েছে।

'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর নগর সভ্যতা, আর বনজীবনভিত্তিক সভ্যতা নাটককারকে আকৃষ্ট করেছিল। নগরজীবন কেন্দ্রিক সভ্যতার মানুষরা বিপদে পড়লে বনজীবনকেন্দ্রিক সভ্যতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

আমরা নির্বাচিত একাঙ্ক নাটকগুলি নিয়ে কথা বলব।

বনজোছনা

মনোজ মিত্রের 'বনজোছনা'-নাটকটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মুখার্জীকে। নাটকের সূচনায় বাড়ির আশ্রিত কাজের মেয়ে কুহুর স্মৃতিচারণা। কুহু রোশনি রায়ের বাড়িতে ঘর মোছা, বাসন মাজা, ব্যাঙ্ক, বাজার, অতিথি আপ্যায়নের কাজে নিযুক্ত ছিল। নতুন, নতুন গল্পের প্লট দিয়ে রোশনি রায়কে লেখিকা হিসাবে বিখ্যাত করে তোলায়, আলাদা খাতির পেত। ভূতের গল্পকার হিসেবে রোশনি রায়ের পরিচিতি

তৈরি হয়। কুহু চারিদিকের প্রশংসা শুনে বুঝতে শেখে কোন গল্প লোকে নেবে, আর কোন গল্প নেবে না। সে বলে ঘর সংসারের গল্প পুরনো হয়ে গেছে, এগুলো লোকজন নেবে না। কুহুর বাড়ি জলপিড়ে, যেখানে ভূত নিয়ে নানা কিংবদন্তি চালু আছে।

তাদের গাঁয়ের ভূত-কপালী মানুষ বনজোছনা। মৃত পুষি বেড়াল বনজোছনার ডাকে জীবিত হয়ে যায়। শ্রাদ্ধবাড়িতে বনজোছনার ডাক পড়ত। মৃত মানুষদের ফিরিয়ে আনার জন্য। কুহু রোশনিকে বলে—

> ''ছোট্টবেলা থেকে ভূত দেখছে বুড়ি। হাজার হাজার হয়ে গেল এদ্দিনে। জলপিঁড়ে গায়ে হেন একটা লোক নেই যে বুড়ির মুখে সেসব কথা শোনেনি। গপ্পোর টানে কতো দূর দূর থেকে যে লোকে ছুটে ছুটে তার ঠাঁয় আসে দিদি!''[১]

রোশনি রায়ের বাড়িতে বনজোছনাকে নিয়ে আসে কুহু। খবর পেয়ে একের পর এক লোকজন আসতে থাকে রোশনি রায়ের বাড়িতে। একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ পেলে স্রোত ধরে রাখা মুশকিল। কালোছায়া, কলেজ স্ট্রীটে ভৌতিক রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের একমাত্র পাবলিশার্স। কালোছায়া বিজ্ঞাপন ছাড়ে, ''জলপিঁড়ের বনজোছনার সত্যি ভূতের গপ্পের ভিত্তিতে জীবনমুখী ভৌতিক উপন্যাস।''[২] রোশনি রায় বনজোছনার মুখে গ্রামবাংলার ভূতের গল্প শুনতে চায়, নিজের কল্পনার পরিসর বৃদ্ধি করার জন্য। ভূতের গল্প, অলৌকিক জগতের কাহিনি নিয়ে দেশ বিদেশে নানা গল্প আছে ইন্টারনেটে যা সহজলভ্য। তবুও প্রান্তিক গাঁয়ের এক বুড়ির গল্পের প্রতি তীব্র আকর্ষণ মানুষের। যে গল্পে তেমন ভয় নেই। ভূতেরা সব কাছের মানুষ, কাঁটা বেছে মাছ খাওয়ার কথা বলে।

আমরা দেখব গাঁয়ের মানুষ বনজোছনার বুদ্ধির দিক। বনজোছনা শহরের মানুষের চালাকি বুঝতে পারে, কুহু দীর্ঘদিন শহরে কাজ করেও যা বুঝতে পারেনি। বনজোছনা রীতিমতো নাজেহাল করে ছেড়েছে লোকজনকে। গল্প বলার আকর্ষণ তৈরি করে শহরকে কেন্দ্র করে তার অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণ করেছে। রাবড়ি, জিলিপি, হোটেলে বসে ভালোমন্দ খাওয়া থেকে শুরু করে মেট্রোরেল, সেকেণ্ড হুগলি ব্রিজ ঘোরা ও তসরের শাড়ি, দশগাছা চুড়ি পরার স্বাদ সব মিটিয়েছে।

আমরা সমাজে দেখতে পাই, চালচুলোহীন মানুষ হঠাৎ করে বিখ্যাত হয়ে গেলে তার দাবিদার এসে জোটে। নাটকের কাহিনিতে আমরা দেখব, যারা বনজোছনাকে একসময় কেউ পাত্তা দিত না, সম্পর্ক রাখত না, তারাই খবর পেয়ে শহরে চলে আসে নাতি, নাতনির দাবি নিয়ে।

কুহু বনজোছনার নাতনি বলে পরিচয় দিয়ে, রোশনি রায়ের বাড়ি আসে। কিন্তু এ পরিচয় সত্য নয়, আমরা বুঝতে পারি ফোকের উপর পি এইচ. ডি করা জলপাইয়ের কথায়। বনজোছনা বন্ধ্যা রমণী। রোশনি রায়কে জলপাই জানায়—

> ''নিজের না থাকলেও বুড়ি মনে করে জলপিঁড়ার সবাই আপনজন। আর জলপিঁড়ার বাচ্চাগুলানে তো ঠাকুমা বইলতে অজ্ঞান। গল্প বলার সেতু দিয়া বুড়ি তাগো লগে সম্পর্ক রচনা করে। বাচ্চাগুলানও ঐ স্পেলে পইড়া মনে করে, বুড়ি উয়াদের আপন দাদিমা! হইতে পারে আপনের কুহু সেইরকম এক বাচ্চা!''[৩]

জলপাই রোশনি রায়কে বুঝিয়ে দেয়, তথ্য যাচাই করার জন্য ফিল্ড-স্টাডি করতে হয় তাকে। ঘরে বসে রোশনি রায়ের মত অন্যের কাছে থেকে গল্পের প্লট পেয়ে কাজ সারতে পারেন না তিনি।

বিচক্ষণ মানুষ বনজোছনা। যার গ্রামের সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। যেকোনও প্রলোভনে বিকিয়ে দিতে পারবে না। নাটকের শেষে বনজোছনা কুহুকে বলে—

> ''গল্পগুলো বলে দিলে আমাদের কি থাকত বল? জলপিঁড়ের জলও থাকত না, পিঁড়েও থাকত না .... কেউ আর জলপিঁড়ের দিকে ফিরেও তাকাত না। তাই না?''[৪]

এমন মানসিকতাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। ভূতের গল্প বলে পৃথিবীতে আসলে কিছু নেই, সব গল্পই মানুষের এই

বোধে উত্তীর্ণ হন বনজোছনা।

নাটকের কাহিনিতে লেখকদের লেখার অন্তরালের অন্ধকার দিক, গ্রাম-শহরের মানুষের মানসিকতার দ্বন্দ্ব, গ্রামের সংস্কৃতির প্রতি মানুষের চিরকালীন আকর্ষণের দিক উঠে এল। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এক অঙ্কের নাটক, প্রান্তের মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নামের বৈচিত্র্য—বনজোছনা, জলপাই, কালোছায়া প্রভৃতি। ভৌতিক কাঠামোর আড়ালে মানুষের এক জীবনসত্যের পরিচয় মনোজ মিত্রের 'বনজোছনা'-নাটক।

নিউ রয়্যাল কিস্‌সা

'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা'-নাটকটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আমরা হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কথা জানি। নাটককার মনোজ মিত্রের স্বতন্ত্রতা কৌতুকের আড়ালে সিরিয়াস বিষয় পরিবেশনে। নাটকটিতে আমরা দেখব কৌতুকের আড়ালে রাজা, মন্ত্রী ও পারিষদের আলাপের মধ্যে রাষ্ট্রের শোষণ-শাসন ব্যবস্থার নানান দিক উঠে এসেছে। নাটকের শুরুতে, গানের মধ্যে দিয়ে রাজতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—

> ''ছেলে চেনে, বাপে চেনে, চেনে ঠাকুরদাদা
> মুখে মুখে নিয়ে তাকে চলে কিস্‌সা ফাঁদা ....
> গপ্পে চিনি গানে চিনি ছড়ায় কবিতায়
> থিয়েটারে বারে বারে সে ঘুরে ফিরে যায় ....
> বলো তার নাম বলো, সে কোন রাজতন্ত্র
> দু অক্ষরে নাম তার পিঠে হবে চন্দ্র ....''[৫]

কিংবদন্তির রাজা হবুচন্দ্র ও তার মন্ত্রী গবুচন্দ্র পাগলা গারদে থাকার সময় তাদের পুত্রদ্বয় দ্বিতীয় গবুচন্দ্র ও দ্বিতীয় হবুচন্দ্র শাসনভার গ্রহণ করে।

খেতাব বা পুরস্কার নিয়ে অন্তরালের গল্প আছে। শাসক দেশের সমস্ত খেতাব নিজেই নিয়েছেন। রক্ষকই যেন ভক্ষক। নোবেল প্রাপ্তিতে তার হাত নেই, সাগরপাড়ের জিনিস। কী করলে নোবেল প্রাপ্তি যোগ ঘটতে পারে এ নিয়ে জ্যোতিষী তথা গুরু বাঁকাশশীর পরামর্শ নেয় হবুচন্দ্র রাজা। বাঁকাশশী ভবিষ্যদ্বাণী করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হবুচন্দ্রের নোবেল প্রাপ্তি যোগ ঘটবে। পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা অনেকসময় দেখি, যোগ্যতার চেয়ে যোগাযোগ বড় হয়ে ওঠে। মন্ত্রী গবুচন্দ্র রাজার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে—

> ''সাহিত্যে অষ্টরম্ভা .... আর বিজ্ঞান? কচু খেয়ে গাল কুটকুট করলে, কীসে কুটকুটুনি বন্ধ হয়—এটুকুও যে জানে না .... জানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না .... তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনাই বা কতটুকু যে নোবেল প্রাইজ পাবে! নোবেল নিয়ে ইয়ার্কি!''[৬]

হবুচন্দ্রের রাজত্বে গত চব্বিশ ঘণ্টায় আড়াইশো চুরি, ডাকাতি হয়। ৭ খানা পল্লীর নাগরিক দল হবুচন্দ্রের কাছে আর্জি জানাতে আসে। কাকতাড়ুয়া লোকটি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস রেখেছে। আমাদের সমাজে এমন দু-একজন পাওয়া যায়, যারা নির্ভয়ে প্রশ্ন করার সাহস রাখে—

> ''রাজা তোর কাপড় কোথায়?''

হবুচন্দ্র রাজাকে লোকটি বলে—

> ''আজ্ঞে যে দেশে দিনদুপুরে চুরি ডাকাতি খুনজখম ধর্ষণ মর্ষণ সবই চলে, সে দেশে টাকা ব্যয় করে পুলিশ প্রশাসন সাজিয়ে রাখার কী দরকার। তার চেয়ে আমাদের মতন কাকতাড়ুয়া পুষুন মহারাজ .... আর কিছু না হোক খোকাখুকুরা আমাদের দেখে একটু ভয় পাবে!''[৭]

যে রাজত্বে সুবিচার পাওয়ার জন্য থানায় ডায়েরি প্রহসন। ডায়েরি করার জন্য কোনও ছিঁচকে চোরও ধরা পড়ে না। আমরা, আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে যেন দেখতে পাই। যে রাজ্যে কোনও শান্তিই নেই, সেই রাজ্যের রাজা

শান্তির জন্য নোবেল পাচ্ছেন, যা হাস্যকর। ছাত্ররা মদ, গাঁজা, ড্রাগ খাচ্ছে, শিক্ষকরা বেশিরভাগ দিন ক্যাজুয়াল ছুটি নিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করছে। বেকাররা ধুঁকছে। হাসপাতালে ডাক্তার নেই, বেড নেই, অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই। তবুও দেশ চলছে, রাজ্য চলছে। প্রতিবাদী স্বর যেন ঝিমিয়ে। নেতা, মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজ চলছে। বাঁকাশশী চরিত্রটির কথার মধ্য দিয়ে শাসকের দুর্বলতার ছবি আমরা পাই, ''যত চোর ডাকাত ধরা হবে, ঠ্যাঙানো হবে, তত যে দুনিয়া জেনে যাবে, এ দেশটা অশান্তির ডিপো!''[৮]

ভোটে জেতার পর নেতা-মন্ত্রীদের স্বজনপোষণ সাংঘাতিক মাত্রায় চলতে থাকে। ব্যতিক্রম আছে, কিছু ভালো লোকও থাকে। চোর, পকেটমার, দুর্নীতিবাজরা মন্ত্রীর চেয়ার পেয়ে, নিজেদের মত করে শাসন ব্যবস্থা চালাতে থাকে। রাজনীতি সমাজের পরিবর্তন নিয়ে আসে নানা ক্ষেত্রে। নেতা-মন্ত্রীর আসনে শিক্ষিতদের আসা উচিত বেশি মাত্রায়, কিন্তু আমাদের সমাজে, উল্টো রূপ দেখতে চাই। যোগ্য মানুষরা, অযোগ্যদের কাছে মাথা নত করছে। কিন্তু এই অরাজক অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। বিপুল জনশক্তির আবেদনের কাছে শাসক মাথা নোয়াতে বাধ্য। নাটকের পরিণতিতে ও আমরা দেখি হবুচন্দ্রও মন্ত্রী গবুচন্দ্রের বংশ পরম্পরার রাজনীতির পতন হয়। সাধারণ মানুষের হাতে দেশের শাসনব্যবস্থার চাবি চলে আসে।

এক অঙ্কের নাটক, কিছু গান ব্যবহার করা হয়েছে। নামকরণে 'কিসসা' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করার মত। চরিত্রদের নামগুলো কৌতুকময়, যেমন—বাঁকাশশী, প্রেমশশী, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি। মনোজ মিত্রের নাটকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কৌতুকের আড়ালে সিরিয়াস বিষয় উপস্থাপন, এই নাটকেও আমরা কৌতুকের আড়ালে দেশ ও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার কদর্য রূপ দেখতে পাই।

রূপের আড়ালে

'রূপের আড়ালে'-নাটকটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মনোজ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প থেকে এই নাটকের কাহিনি গ্রহণ করেছেন। ইলা-বিতানের ১৫ দিনের বিবাহিত জীবন। সুন্দরবনের দু'দিনের স্টিমার ট্রিপকে কেন্দ্র করে নাটকের বিষয় এগিয়েছে। ইলা-বিতান মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছে। স্টিমারে পরিচয় সোহিনীর সঙ্গে। সোহিনীর সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায় স্বগোতোক্তি থেকে—

> ''আর আমার কাজটাও হয়েছে তেমনি একঘেয়ে! বাচ্চাদের স্কুলে রূপকথা আর রাইমস শেখানো! তাও যদি মেয়েগুলো আমায় পছন্দ করত! ভালো তো বাসেই না .... একদমই না .... উলটে এ বছরের বাচ্চাগুলো আবার দেখলেই ছুটে পালাতে চায়! আমার ভয় পায়। (একটু থেমে) স্কুলের চাকরিটা আমার চলেই যাবে বোধ হয়! কর্তৃপক্ষ আর রাখতে চাইছে না! সত্যি তো, যাদের জন্যে রাখা সেই শিশুরাই যদি আমায় সহ্য করতে না পারে! .... যদি মুখ দেখে আঁতকে ওঠে! দেখছেন তো, সারা মুখটা আমার পোড়া .... ঝলসানো .... সাদাকালো, কদাকার একতাল .... না, আহা-উঁহুঁ করবেন না। (কঠিন গলায়) মোটে সহ্য হয় না।''[৯]

সোহিনীর মুখ পুড়ে যায়, কোনও এক এক্সিডেন্টে। দুর্ঘটনার পর থেকে দিনের পর দিন মানুষের সমবেদনায় আহত হতে থাকে। আমাদের সমাজে একথা বাস্তব, নিয়মভাঙা কিছু দেখলেই কৌতূহলী চোখ সদাজাগ্রত থাকে। আমরা ভুলে যায় সমব্যথী হওয়াটাও কোনও কারণে অপরপক্ষের কাছে বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। আমাদের নাটকের সোহিনী সমাজের কৌতূহলী চোখের শিকার। কোনও জায়গায় গিয়ে প্রশ্নবাণ থেকে নিস্তার পায় না। স্টিমার ট্রিপে আমরা দেখব সোহিনী নিজের রক্ষাকবচ হিসাবে কোন বিষয়কে আশ্রয় করছে।

স্টিমারে সোহিনী আর ইলা দু'জন মাত্র মেয়ে। ইলার গান শুনে সোহিনী নিজেই আলাপ করতে আসে। স্টিমারের চারপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে দুজনে কথা বলে। বিতান, ইলার স্বামী পেশায় ডাক্তার। দু'জনের আলাপের মধ্যে বিতান এসে যোগ দেয়। এড়িয়ে যেতে চাইলেও বিতানের কৌতূহলী চোখ বার বার প্রশ্ন

করে সোহিনীকে—কীভাবে সোহিনীর মুখ পোড়ে, সার্জারি করলে ঠিক হয়ে যেত। সোহিনী প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইলেও শেষপর্যন্ত পারে না। চলে আসতে বাধ্য হয় বিতান-ইলার কাছ থেকে।

সোহিনী বিতানের প্রশ্নবাণে অতিষ্ট হয়ে। ক্ষোভ উগরে দেয় নিজেরই কাছে স্বগতোক্তি—

> "(ছটফট করছে) কী করে হল! কী করে হলো দিদি? .... সেই কৌতূহল! কেবল কৌতূহল! কৌতূহলের অন্ত নেই। গা জ্বলে যায়! যে দেখবে সেই! সবাই মিলে! বাটলারটা পর্যন্ত ঘ্যান ঘ্যান করছে .... কী করে পুড়ল! ভুলতে দেবে না! কিছুতে ভুলে থাকতে দেবে না? হাঁপ ছাড়তে জলে ভাসলাম .... সেখানেও রেহাই নেই! আহা .... আহা .... মেয়েদের চেহারা নষ্ট হওয়া যে কত বড় অভিশাপ! .... সিমপ্যাথি! আসলে .... আসলে কী বলতে চাস তোরা? দ্যাখো দ্যাখো আমরা কত ভাগ্যবান! কেমন ঝকঝকে ফুলের মতো! আর তুমি? ওঃ আমি পাগল হয়ে যাব—পাগল করে দেবে সবাই মিলে! ইচ্ছে করে .... ইচ্ছে করে ...."[১০]

সোহিনীর যন্ত্রণা আমাদের ভাবায়, অজান্তে সমব্যথী হতে গিয়ে আমরা মানুষকে দুঃখ দিয়ে ফেলি। দিনের পর দিন একই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হতে হতে সোহিনীর মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম হয়, বিতান-ইলাকে একটি মেয়ের গল্প শোনায়। গল্পের চরিত্র সত্যেন-লক্ষ্মী-বিতান ডাক্তার। বিতান নিজের নাম গল্পের চরিত্র হিসেবে উঠে আসায় প্রথমে আপত্তি করেছিল। গল্প শুরু হয়। লক্ষ্মীর স্বামী সত্যেন, কালব্যাধিতে এক বছরের মধ্যে মারা যায়। সত্যেনের অসুস্থ হবার সুযোগে, বন্ধুকে সাহায্য করার অছিলায় লক্ষ্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বিতান ডাক্তার। সত্যেনকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়ে, হোটেলের রুমে জোর করে লক্ষ্মীর শ্লীলতাহানি করে বিতান। লক্ষ্মীকে একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবও দেয়। বিতানের প্রস্তাবে রাজি না হলে, অ্যাসিড মেরে লক্ষ্মীর মুখ পুড়িয়ে দেয় বিতান।

সোহিনীর গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, বাস্তবের বিতানের অনেক বৈশিষ্ট্য। দুজনের মিলের জায়গাগুলো—

১. উভয়ের গলদা চিংড়ি পছন্দ।

২. দুই বিতানই বেশি কথা বলে, আর মাঝে মাঝে হা হা করে হেসে ওঠে।

৩. ডান হাতের কবজিতে দুজনের কাটা দাগ।

৪. গল্পের বিতানের বউয়ের নামও ইলা।

ইলা বিতানকে সন্দেহ করে, বিশ্বাস করে তার স্বামী বিতান ও সোহিনীর সৃষ্ট চরিত্র বিতান একই মানুষ। বিতান যুক্তি দেয় ভদ্রমহিলার অসাধারণ কাল্পনিক, গল্প বলার ক্ষমতা আছে, আগে কখনও সোহিনীকে দেখেনি ইত্যাদি। ইলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠক কিম্বা দর্শকরাও ইলার স্বামী বিতানকে সন্দেহ করতে শুরু করি। কিন্তু নাটকের শেষে সোহিনীর স্বগোতোক্তিতে আমাদের ভুল ভেঙে যায়—

> "না, কোনও বিতানের অ্যাসিডে এ মুখ পোড়েনি আমার। পুড়েছিল বারো বছর বয়েসে। চা করতে গিয়ে জ্বলন্ত স্টোভ বার্স্ট করে! সেই থেকে আমার কদাকার এই মুখটা লোকের কৌতূহলের বস্তু। .... কী বলছেন স্টোভ ফেটেই যদি মুখ পুড়েছিল তবে মিথ্যে করে ওদের এ গল্প বললাম কেন? কেন বলব না? ওরা কেন সমবেদনা জানাতে এল! কেন বলে গেল মেয়েদের মুখ পুড়ে গেলে আর কিছুই থাকে না! সারাজীবন দগ্ধে দগ্ধে মরছি। কেউ আহা-উঁহু করলে ইচ্ছে করে দিই সব পুড়িয়ে, ভেঙেচুরে তচনচ করে! (হেসে) ওরা এখন কাঁপছে, সন্দেহ সংশয়ে ভীরু ইলা রায় জ্বলছে।"[১১]

সোহিনী প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষণিকের জন্য তৃপ্তি পেলেও নিজেকে শেষপর্যন্ত ধিক্কার জানায়। দুটো জীবন বিষিয়ে দিয়েছে, মুখের সঙ্গে সঙ্গে তার মনও পুড়ে গেছে।

নাটকটিকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক বলতে পারি। এক অঙ্কেরও দশটি দৃশ্যে সমাপ্ত। রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার আছে। যেমন—

১. যদি আরও কারে ভালোবাস ....

২. আজ ধানে ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় ....

৩. এখন আমার বেলা নাহি আর .... প্রভৃতি।

মঞ্চে চিত্রে

'মঞ্চে চিত্রে'-নাটকটি মনোজ মিত্র লেখেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ নাটকটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে মঞ্চের অভিনেতা ও চিত্র তথা চলচ্চিত্রের অভিনেতার কোন দিকগুলো উঠে এসেছে আমরা দেখব।

নাটকটির শুরুতেই আছে—

> ''মঞ্চাভিনেতা মঞ্চে থাকেন,
> আর চিত্রাভিনেতা চিত্রে
> বিধির বিধানে কিম্বা কে জানে
> মিলন হইল দুই মিত্রে।''[১২]

চিত্রাভিনেতা অভিযোগ করে মঞ্চাভিনেতাকে—থিয়েটারের চাষী শুনলে তার হাসি পায়। কারণ কোনওদিন একগোছা ধানের শিষে কাস্তে ছোঁয়াতে পারে না। মাঠের ধুলোয় পা রাখতে পারে না, জলে কাদায় হাঁটতে পারে না, লোহার কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। পলকা টিনের খেলনা কোদাল নিয়ে তাদের অভিনয় করতে হয়। মঞ্চে তারা পেপার পাল্প দিয়ে গাছ বানায়, ফুল প্লাস্টিকের, লতাপাতা ফোমের ন্যাতা, সব সাজানো, বানানো জিনিসপত্র। ফিল্মে সব চলমান, সচল, জীবনের গতি আছে। মঞ্চে পড়ে থেকে লাভ নেই। মানুষকে সাজিয়ে ঘোড়া বানানো হয়, কৃত্রিম জিনিসপত্র মানুষ দেখে। চেঁচিয়ে অভিনয় করতে হয় থিয়েটারে। কণ্ঠস্বর ও মেকাপ উগ্র। সূক্ষ্ম অভিনয় মঞ্চে সম্ভব নয়। সিনেমায় ঝুঁকি কম, অনেকবার সুযোগ দেবে পরিচালক অভিনয়ের। অভিনেতার গলা ভেঙে গেলেও কিছুদিন সময় পাবে ঠিক করার। আড়াই ঘণ্টার নাটকে একটানা অভিনয় করা বেশ ক্লান্তিকর। চলচ্চিত্রে একটা ছবির শুটিং চলে প্রায় মাস খানেক ধরে। মাঝপথে পার্ট ভুলে গেলে নতুন করে নেওয়া হয়, মঞ্চে সেই সুযোগ নেই। নিজের অভিনয় চিত্রে দেখে ভুল দিক সংশোধন করা যায়, নিজেই নিজের সমালোচক হওয়া যায়। মঞ্চের অভিনেতাকে অন্যের সমালোচনার উপর নির্ভর করতে হয়।

মঞ্চাভিনেতা যুক্তি দেয়—

> ''জ্ঞান দিয়ো না। ঐ মিথ্যেকে সত্যি বলে দাঁড় করাও তো দর্শকের চোখে ... বুঝি তোমার কেরামতি! লোহার কোদাল চালালে সবারই গা-হাত-পা টনটন করে, টিনের কোদাল কাগজের কোদাল নিয়ে সেই টানাটানিটা জাগিয়ে তোল দেখি পেশীর ওপর .... স্টেজে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ!''[১৩]

মঞ্চাভিনেতা আরও জানায় চলচ্চিত্রেও কৃত্রিমতা তৈরি করা যায়। কয়েক বস্তা বালি ছড়িয়ে মরুভূমি কিম্বা ঢিবির উপর নুন ছড়িয়ে তুষারবৃত্ত হিমগিরি, অচল রেলগাড়িকে সচল দেখানো চলে। তিনি বলেন মঞ্চে—

> ''আমরা বস্তুর বাহ্য চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাই না। বস্তুর আদলটুকু দেখিয়ে জীবন্ত মানুষের রি-অ্যাকশন দেখাই। শুধু রেল কেন মঞ্চে ঘোড়া তুলতে হলে মানুষকেই ঘোড়া সাজাই। দর্শক আপত্তি করে না। থিয়েটারের দর্শক বস্তুজগত দেখতে আসে না, আসে মানুষের অন্তর্জগত বুঝতে।''[১৪]

দর্শকের সামনে মঞ্চে অভিনয় করতে হয়, অসুস্থ হলেও শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে যায় অভিনয়ের প্রতি। যখন হাজার হাজার দর্শকের হাততালিতে মুখরিত হয় অভিনেতা অনুভূতি বুঝতে পারে, সবার সামনে নিজেকে মেলে ধরার এক অকৃত্রিম আনন্দ আছে। মঞ্চে—

> ''একটা আমি অভিনয় করবে, আর একটা আমি চারদিকে পাহারা দেবে। আমিই আমার সম্পাদক, আমিও আমার শব্দযন্ত্রী। আমিই আমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। আমার সার্বভৌম কর্তৃত্ব। অর্জুনের মনোযোগ ভীষ্মের সহনশীলতা, কর্ণের বিক্রম আর শ্রীকৃষ্ণের রিফ্লেকস্ বা তাৎক্ষণিক প্রত্যুৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে

গড়ে ওঠে একজন মঞ্চাভিনেতা, একটি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব।''[১৫]

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে কথার সুতো দিয়ে মঞ্চাভিনেতারা নকশীকাঁথা বানান। থিয়েটার প্রতিদিন জীবন্ত হয়। নিজেকে সৃষ্ট চরিত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার মাপ রাখতে হয়। বারে বারে নিজেকে নতুন করে গড়া যায়। মঞ্চাভিনেতার কাছে চিত্রাভিনেতার যুক্তি শেষপর্যন্ত থেমে যায়।

এক অঙ্কের স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন নাটককার মনোজ মিত্র। যে প্রশ্ন সমাজে চলতে থাকবে, মঞ্চ ও চিত্র দুটি মাধ্যমকে কেন্দ্র করে।

কৌতুকের আড়ালে মনোজ মিত্রের নাটক আমাদের সমাজের বাস্তব বিষয়গুলো দেখায়। আমরা নির্বাচিত নাটকগুলির মাধ্যমে শাসক শক্তির রূপ, লেখক হয়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি, বাহ্যিক চেহারার আড়ালে মানুষের ভেতরের রূপ, মঞ্চ ও চিত্রের অভিনেতাদের নানান দিকের আভাস পেলাম। ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হব আমরা মনোজ মিত্রের নাটকের নব নব আঙ্গিক ও বিষয় থেকে।

তথ্যসূত্র

১. মনোজ মিত্র, 'নাটকসমগ্র ৫ম খণ্ড', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ২৩৭।
২. তদেব, পৃ. ২৫১।
৩. তদেব, পৃ. ২৫৫।
৪. তদেব, পৃ. ২৫৬।
৫. তদেব, পৃ. ২৫৯।
৬. তদেব, পৃ. ২৬৩।
৭. তদেব, পৃ. ২৬৬।
৮. তদেব, পৃ. ২৬৮।
৯. তদেব, পৃ. ২৮৮।
১০. তদেব, পৃ. ২৯৩।
১১. তদেব, পৃ. ৩০৪।
১২. তদেব, পৃ. ৩০৭।
১৩. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১৪. তদেব, পৃ. ৩০৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৩১১।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।
দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, কলকাতা, দে'জ সংস্করণ, ১৯৯৪।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮।
মনোজ মিত্র, নাটকসমগ্র পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৩।
মনোজ মিত্র, অমর মিত্র, ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে, বইমেলা, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০১।
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৮।

ঈশিতা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্থান

কমল মাঝি

মধ্যবিত্ত সমাজের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫); তাঁর সমকালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষিত, রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনা, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদি তিনি চাক্ষুস উপলব্ধি করেছেন। বিশেষ করে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের পূর্ববাংলা অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলায় আগমন। ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রভাব পড়ে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই সমস্ত ঘটনাই নিজের কলমের জাদুতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের চারপাশের চেনাজানা চরিত্র ও ঘটনা তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'গল্পমালার' প্রথম খণ্ডে 'গল্প লেখার গল্প'তে লিখেছেন—

> ''সব লেখকই নিজের চেনা জানা গণ্ডির ভিতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই। তবে কেউ কেউ বলেন আমার লেখায় সামান্য ছদ্মনামের আড়াল যদি বা থাকে ছদ্মবেশের আড়ালটুকু থাকে না, যাদের নিয়ে লেখা তারা নিজেদের চিনে ফেলে। পাঠকদের মধ্যে যদি তাদের আত্মীয় কেউ থাকে তারাও জেনে যায়।''[১]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগুলিতে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই মধ্যবিত্ত সমাজ দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে আগত মধ্যবিত্ত মানুষ। যারা নিজেদের জীবন-জীবিকার তাগিদে এপার বাংলায় আশ্রয় নিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের অব্যবহিত পরেই বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দার ঢেউ লেগেছিল এদেশের জনজীবনে। মানুষের সামাজিক জীবন উথাল-পাতাল হয়ে যায়, দেশ জুড়ে মন্দা, ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ইত্যাদির কারণে পরিবারের পুরুষদের চাকরি হারিয়ে যায়। সংসার চালাতে হিমশিম খায় তারা। এই সময়ে একমাত্র বাধ্য হয়েই ঘরের লক্ষ্মী উপার্জনের তাগিদে ঘরের বাইরে পা রাখে। শুরু হয় বাঙালি নারীর নতুন জীবন সংগ্রাম।

> ''নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা আখ্যান বিশ্বে যখন জায়গা করে নিয়েছেন তখন মেয়েদের স্বাধিকার অর্জনের পালা একভাবে শুরু হয়েছে উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হবার মধ্যে দিয়ে; মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনেরও সেই শুরু। উপার্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের ওই অংশগ্রহণ ছিল এক অর্থে পুরুষ-বিশ্বে দখলদারি; যার পিছনে ছিল পরিবার ও সমাজ জীবনে উদ্ভূত নানা সমস্যা ও দুর্ভাগ্যের মোকাবিলায় মেয়েদের বাধ্যবাধকতা, ... দারিদ্র-দীর্ণ জীবনযাত্রার সামান্য মানোন্নয়নের জন্য কিংবা দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের নিশ্চিত জোগানের জন্য মধ্যবিত্তের গৃহবেষ্টনী থেকে মেয়েদের বেরিয়ে আসার বাধ্যবাধকতা এমনি করেই তৈরি হয়েছে।''[২]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা' প্রথম খণ্ডতে 'মহাশ্বেতা', 'সেতার', 'কাঠগোলাপ', 'চেক', 'অভিনেত্রী', 'অবতরণিকা' ইত্যাদি ছোটগল্পে নারীর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উত্তরণের কথাই গল্পকার ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে 'চেক' (১৯৪৮), 'কাঠগোলাপ' (১৯৫৩), 'ছোট দিদিমণি' (আশ্বিন-১৩৬০) এই তিনটি গল্প আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

'চেক' (১৯৪৮) গল্পে সরসী দত্ত নামে এক অবিবাহিত নারীর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে যা একেবারেই অসম্ভব। বাঙালি নারীর ঘরের বাইরে পা ফেলার প্রথম

মাঝি, কমল : নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্থান
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 36-41, ISSN 2249-4332

সূত্রপাত। এই সূত্রপাত যা একান্ত অনিচ্ছায়, সময় প্রতিকূল হওয়ায় সেই প্রতিকূলতার হাওয়া এসে লাগল সমাজ ও পরিবারে, বাঙালির সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল। বাঙালি নারীরা আর গৃহবধূর তকমা নিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে বিরাজ করতে পারল না। কেবলমাত্র বিবাহিত নারীরা নয় অবিবাহিত নারীরা ঘরের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে হাত দিল। সরসী দত্ত এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সামান্য মেয়ে। পরিবারে রুগ্ন বৃদ্ধ বাপ, যিনি কোন এক মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করতেন। হিসাবের গোলমালের কারণে চাকরি চলে যায়। আর কোনো কাজ তিনি জোটাতে পারেননি। অসুখ-বিসুখে স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গেছে। আগের মত কোনো কাজ করার সামর্থ্য নেই। সরসীর দিদি বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সেও পরিবারের ঘাড়ে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে সরসী বাধ্য হয়েছে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলে। কোনরকমে ম্যাট্রিক পাশ করায় একটা কাজ জোটাতে পেরেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে সরসীর উপার্জনের তাগিদে গৃহের বাইরে পদার্পণ। কিছুটা বাধ্য ও কিছুটা দায়িত্ব তাকে বাধ্য করেছে চাকরিতে যোগ দিতে। এই রকম সাংসারিক টানাপোড়েন, আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও সরসীর পিতা চাননি সরসী চাকরি করুক।

> "প্রথমে অবশ্য খুব আপত্তি করেছিলেন সরসীর বাবা। মেয়েকে কিছুতেই পুরুষদের অফিসে চাকরি করতে দিতে চাননি। বলেছিলেন, না খেয়ে মরবেন, আধপেটা খেয়ে থাকবেন সেও ভালো, তবু মেয়েকে আগুনের মধ্যে আর পাঠাবেন না।"[৩]

সরসীর পিতা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেননি। না খেয়ে মরা সহজ নয়, আধপেটা খেয়ে বাঁচা আরও কঠিন। সরসীর পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরসী অফিসের কাজে যুক্ত হয়। অফিসটা ছিল বেসরকারি। সরসী প্রথম দিন একটু ঘাবড়ে গেলেও ধীরে ধীরে নিজেকে উপযুক্ত, যথাযোগ্য করে নিয়েছে, সমস্ত কাজ পুরুষদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। সরসীর সঙ্গে সুবিমল ঘোষের বন্ধুত্ব তৈরি হল। দুজনে একসঙ্গে অফিস শেষে বাড়ি ফেরে। চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খায়। স্বচ্ছন্দে গল্প করে। সরসী আগের থেকে অনেক পরিণত, প্রগলভা। আসলে সময় তাকে বাধ্য করেছে পরিবর্তন হতে। নিজের পাওনা বুঝে নিতে।

সরসী দত্ত অফিসে যুক্ত হবার পর বছরের শেষে সকলের মাইনে বেড়েছে। সেই বর্ধিত মাইনের তালিকা টাইপ করতে থাকে সে। কিন্তু সেই তালিকায় কোথাও নিজের নাম খুঁজে না পেয়ে সরসী অবাক হন। সে চুপচাপ বসে থাকেনি, সকলের মাইনে বর্ধিত হলে তার না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছে। নিজের হাতে ম্যানেজারকে চিঠি লিখেছে। অফিসের সকলে সরসীর আচরণে সন্ত্রস্ত হয়েছে। সুবিমল পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। ম্যানেজারের কাছ থেকে প্রকৃত কারণ জানার পর আশ্বস্ত হলেও একেবারে শান্ত হয়নি। সুবিমল সান্ত্বনা দিয়ে সরসীকে বুঝিয়েছে মাসে বাড়তি পাঁচ টাকা সে সরসীকে দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সরসী অনেকটাই সময়ানুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। সে এখন কেবল আর নারী নয়; সে একজন মানুষ। তার মধ্যে তৈরি হয়েছে আত্মসম্মানবোধ। তাই সুবিমল তাকে পাঁচ টাকা করে দিতে চাইলে সে নেয়নি। তার অভ্যন্তরে সম্মান, অধিকার, মর্যাদা বড় হয়ে উঠেছে। সরসীর মনে প্রশ্ন জেগেছে—

> "গোটা পাঁচেক টাকা! কিন্তু অফিসে ইনক্রিমেন্টের সময় পাঁচ টাকার মূল্য কি পাঁচ টাকাই? যোগ্যতা, দক্ষতা, মান-সম্মানে সেই—পাঁচ কি পঁচিশ হয়ে ওঠে না।"[৪]

সরসীর অফিসের ম্যানেজার নবনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে মাইনেকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের সূত্রপাত। এইভাবে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। সরসী নবনী চ্যাটার্জীর মাধ্যমে অফিসে স্বতন্ত্র জায়গা করে নেয়। পূর্বের মত তার সঙ্গে আর কেউ মিশতে পারে না, সুবিমলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আসলে সমাজ জীবনে ঘটা নানা ঘটনা তাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। সে আর আগের মত নেই। অফিস গৃহ সর্বত্রই তার আধিপত্য। অফিসে সকলে তাকে সমীহ করে। বাড়িতে যেন সে গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। অফিস থেকে ফিরলে তাকে কেউ চা করে দেয়,

কেউ জামাকাপড় এগিয়ে দেয় ইত্যাদি। সরসী এখন আর সেই গ্রামীণ মেয়ে নয়। সে শহুরে মধ্যবিত্ত অফিসের কর্মী সরসী দত্ত। একটা সময় সরসী নবনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়। তারা বিভিন্ন স্থানে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে, সিনেমা দেখতে যায়। অফিসে এই সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষো হয়। সরসী কোন কিছুতেই পাত্তা দেয় না। সুবিমলকে এড়িয়ে চলে, হঠাৎ একদিন শোনা যায় নবনী চ্যাটার্জীর বিয়ে। সকলে ভাবে সরসীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। পরে জানা যায় তাদের ধারণা ভ্রান্ত। নবনী চ্যাটার্জীর বিয়ে হয় মমতা মুখার্জীর সঙ্গে। পাত্রী তাদের যোগ্যতাসম্পন্ন। এদিকে সরসীও অফিসে আসা বন্ধ করে দেয়, সকলে চিন্তা করে সরসী পরিস্থিতির শিকার। আদতে তা হয়নি। সরসী বাঙালি ঘরের নারীদের মত কান্নায় ভেঙে পড়েনি। সে বাঁচার জন্য আধুনিকা নারীর মত স্বাধিকার বুঝে নিয়েছে।

সরসী একদিন হঠাৎ চিঠি লেখে অফিসের পুরোনো বন্ধু সুবিমল ঘোষকে। সরসী এখন অন্য সরসী। নবনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর সে শরণ নেয় সুবিমলের। সরসী সুবিমলের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে যা একান্তই অসম্ভব, একজন নারীর পক্ষে ব্যবসা, তাও আবার পার্টনারশিপে! সেই পার্টনার এক পুরুষ! আসলে সরসী ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। তাই সুবিমলের সঙ্গে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। ব্যবসার টাকার জন্য সরসী একটি চেক বার করে। চেক দেখার পর অবাক হয় সুবিমল, সে জানায়, একজন সাধারণ নারীর পক্ষে এত টাকার চেক জোগাড় করা সম্ভব নয়, সেই সময় সরসী জানায়—

> ''সাধারণ যে নই তার প্রমাণ ত ওই চেকেই আছে। সাধারণ যে নই তার প্রমাণ তোমার সঙ্গে ফের দেখা করতে পেরেছি।''[৫]

এই সময় সরসী সুবিমলকে বলে তার দিদি আতসীর স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কথা। অর্থাৎ তার দিদির মত সে আর প্রতারিত হতে রাজি নয়। কেউ যদি তাকে ব্যবহার করে ছুঁড়ে দিতে চায়, তাহলে সে আর মুখ বুজে মেনে নেবে না। সে তার প্রাপ্য বুঝে নেবে। সরসী তাই নবীনবাবুকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়নি। অবশেষে সুবিমলকে সমস্ত সত্য জানায়। চেকের আসল সত্য উন্মোচন করে বলে—

> ''চেকের কথাই শোন। অত টাকা পেলাম কি করে তাইতো জিজ্ঞেস করছিলে! সহজে পাইনি, সাধারণ মেয়ে হয়ে পাইনি, দিনের পর দিন দর কষাকষি করেছি। চ্যাটার্জী দু'হাজার থেকে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আইন আদালত, মমতা মুখার্জী, তাদের নব্যবঙ্গ পত্রিকা, অ্যাসেম্বলীতে অবনীবাবুর মেম্বারশিপ সব মিলিয়ে তো দু'হাজার হতে পারে না, অনেক বেশি। আমি দয়া করে দশে রাজি হয়েছি। চ্যাটার্জী সার্টিফিকেট দিয়েছেন, আমি সাধারণ মেয়ে নই।''[৬]

এখানেই সরসী স্বতন্ত্রা। জীবনের টানাপোড়েনের উত্থান পতনকে সে নিজে উপলব্ধি করেছে, সেই উপলব্ধি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা সরসী নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে আলাদা সত্তা হিসাবে। সামাজিক পারিবারিক চাওয়া-পাওয়ার থেকে নিজে চাওয়া-পাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাইতো এতকিছুর পরেও সে সুবিমলের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

'ছোট দিদিমণি' (নতুন সাহিত্য, পূজা সংখ্যা ১৩৬০) গল্পে পরিলক্ষিত হয় রেবা নামে এক নারীর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কাহিনি। রেবার স্বামী অজয়ের আয় সামান্য। তাতে সংসার চালানো দুষ্কর। রেবার সন্তান-সন্ততি পাঁচজন। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয় সে নতুন কর্মসংস্থানের খোঁজে। সাংসারিক দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি শেষ পর্যন্ত বনমালী বিদ্যাপীঠে চল্লিশ টাকা মাইনেতে কেরানীগিরির কাজে নিযুক্ত হয়। যদিও স্কুলের সেক্রেটারি তাকে নিচের ক্লাসের বাংলা অঙ্ক পড়ানোর কথা বলে কাজে যোগদান করায়। কিন্তু হেডমিস্ট্রেস রেবাকে পড়ানোর বদলে কেরানীর কাজ করতে উপদেশ দেয়। এই সামান্য আয়ে স্বামীকে সাহায্যের পাশাপাশি গৃহের জীর্ণ অবস্থা বদলানোর স্বপ্ন দেখে সে। রেবার এই নতুন কাজে স্বামী খুশি হলেও রেবা হয়নি। রেবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে

পড়ানোর বদলে কেরানীগিরি করছে, সে মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট নয়। স্বামীকে সেকথা বলতেও সে দ্বিধা করেনি। রেবার কাজে অজয় খুশি হলেও রেবা বলেছে—"ভালো না ছাই! স্কুলে ঢুকে যদি পড়াতেই না পারলাম, তা হলে আর কি হল"[৭] রেবা স্কুলে যাবার পর তার সন্তান শিবু বাড়ি থেকে চলে যায়। দুরন্তপনার খবর রেবার কানে আসে। এই নিয়ে সংসারে কথা উঠলে সবাই রেবাকেই দায়ী করে। রেবা অজয়ের দায়িত্বের কথা মনে করালে অজয় উল্টে তিরস্কার করে। রেবা তার স্কুলের কলিগের কাছে শিবুর দুষ্টুমির কথা শুনতে পায়। খারাপ লাগে রেবার। নিজের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। স্বামীকে জানায় সংসারটা তার একার নয়। স্বভাবতই এই কথায় চটে যায় অজয়। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ আধিপত্য অনস্বীকার্য, সংসারে নারীরা যেন তার দাসী। কিন্তু রেবা তা মানতে চায়নি। সে প্রথমে মানুষ তারপরে নারী এই কথাই বলতে চেয়েছে। অজয় এই সময় রেবাকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> "আরো কত শুনবো। তুমি তো ছোট দিদিমণি হয়েছো তাতেই আমার আনন্দ। তুমি তো রঙিন শাড়ি পর, নিত্য নতুন ধাঁচে খোঁপা বেঁধে স্কুলে চাকরি করতে যেতে পারছ তাতেই আমার সুখ, ছেলে বয়ে গেলে বা বকাটে হলে তোমার কি আসে যায়?"[৮]

রেবার ছোট দিদিমণি নামটি স্কুল থেকে প্রাপ্ত। সকলে স্কুলে তাকে এই নামে ডাকে। শিবুর দুরন্তপনা ক্রমেই বর্ধিত হতে লাগল। রেবারও চেষ্টার অন্ত নেই সন্তানকে শোধরানোর। মাঝে মাঝে ভাবে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবে। বাস্তবে তা সম্ভব নয়। অভাব অনটনের সংসার অনেক কষ্টে চলে। তাই রেবা চাকরি ছাড়ার চিন্তা না করে চাকরি স্থায়ী করার ভাবনায় জোর দেয়। নিজের স্কুলে শিবুকে ভর্তি করে। ক্লাসের মেধাবী ছাত্র সমীরের সঙ্গে মেশার পরামর্শ দেয়। এত কিছুর পরেও রেবা শিবুকে শোধরাতে পারেনা, আসলে মধ্যবিত্ত জীবনের জাঁতাকলে পড়ে রেবা আগের থেকে অনেক পরিণত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে শিখে গেছে। এতকিছুর পরেও রেবা হাল ছাড়েনি। সন্তানদের প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। একসময় রেবা শিবু ও তার বন্ধুদের সন্তান-স্নেহে কাছে ডেকে আদর করে। কোথাও তার মনে হয়েছে সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের কথা। কেবলমাত্র নিজের সন্তান নয়, সন্তানের বন্ধুদেরও ভালো করার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে। তার অর্জিত শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। তার বাস্তব রূপায়ণ সে নিজেই করেছে। সকলকে একসঙ্গে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের লাইন পড়ে শুনিয়েছে—"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"[৯]। এখানেই রেবা স্বতন্ত্র। রেবার আচরণের মধ্যেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

'কাঠগোলাপ' (আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা, ১৩৫৫) গল্প ওপার বাংলা থেকে উঠে আসা মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম। এই অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করেছে। এমনই এক নারী অনিমা, যে পূর্ব বাংলার কোন এক গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে বসবাস করতে থাকে। শহরের মানুষদের সঙ্গে বসবাস করতে করতে শহুরে হয়ে ওঠার চেষ্টার বিরাম নেই। অনিমা ক্লাবের সদস্যদের জন্য কাপড়ে কাঠগোলাপের নকশা তৈরি করে। গ্রামের থেকে উঠে আসা পূর্বপরিচিত মানুষদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে যায়। অনিমা যেখানে থাকত তার পার্শ্ববর্তী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজে থেকেই যেচে কথা বলে। নীরদের অজান্তে ট্রেনে, বাসে ঘুরতে যায়। গ্রামের বাঙালি বধূদের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়াই করতে থাকে। নীরদের অজান্তে একটি শাড়ি কেনে অনিমা। এক শহুরে নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। শাড়ি কেনাকে কেন্দ্র করে নীরদের সঙ্গে অনিমার কথা কাটাকাটি হয়। এই সময় অনিমা নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। সে যে নারী নয় মানুষ, এই কথাই বোঝাতে চায় নীরদকে—

> "আর আমার বুঝি কোন কষ্ট নেই? ঝিকে ঝি, ঠাকুরকে ঠাকুর, ছেলেমেয়েদের পড়াটা পর্যন্ত আমাকে বলে দিতে হয়। রাঁধাবাড়া, ঝাড়াপোঁছা, সংসারের কোন কাজটায় আমার না থাকলে চলে শুনি? ফিরিস্তি নিয়ে দেখ, তোমার কাজের চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ আমার কাজ। তোমার মাইনে সোয়াস হলে

আমার মাইনে কম করে হলেও হওয়া উচিত আড়াইশ—তা জান?''[১০]

অনিমা শহরে এসে প্রথম টেলিফোনে কথা বলে। টেলিফোনের নেশায় মেতে থাকে অনিমা। নীরদ অফিসে যাবার পর অনিমা শ্রীপদবাবুর বাড়ি গিয়ে নানা পরিচিত আত্মীয়-অনাত্মীয়দের ফোন করে। নীরদ নিষেধ করলেও অনিমা কানে তোলে না। এই টেলিফোনেই বিপদ নেমে আসে অনিমার সংসারে। সময়ে অসময়ে নীরদকে অফিসে ফোন করায় মালিক বিরক্ত হয়, চাকরি যায় নীরদের। শুরু হয় নতুন জীবন সংগ্রাম। চাকরি হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে নীরদ। সাংসারিক অশান্তি চরমে পৌঁছায়। এই পরিস্থিতিতে নীরদ অনিমাকে গ্রামে পাঠাতে চাইলে সে যেতে চায়নি। অনিমা বলেছে—''যাইতো অন্য সময় যাব। এই দশায় এই বেশে যাব না, কলকাতা ছাড়ব না আমি''[১১] আসলে অনিমা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে না হলেও মানসিক দিক থেকে শহুরে হয়ে ওঠে। এই দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে অনিমা নীরদের পাশে থাকে। উৎসাহ দেয় অন্য কাজ খুঁজে নেবার জন্য। অনিমা নিজেও স্বামীর অজান্তে বিভিন্ন জায়গায় কর্মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। গানের মাস্টারি, সেলাইয়ের দিদিমণি ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে। নিজের শখ, আহ্লাদ, সাংসারিক বিনোদন কমিয়ে দেয়। তবুও কলকাতা ছাড়তে চায়নি। আসলে মধ্যবিত্ত নারী হিসাবে নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লড়াই নিজেই লড়ে। সেই লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি করে সময়ের নানা ঘটনাবলী।

> ''নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে নারী চরিত্র গুলির সবিস্তার আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু দেখা যাবে, আটপৌরে সাধারণ মেয়েগুলি, নারীর সাধারণ অধিকার অর্জন করবার লড়াইয়ে, স্বাতন্ত্র্যের জন্য, নারী হয়ে চলার দাবিগুলির সপক্ষে তীব্র সংকটের সময়ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নির্বিবাদ আত্মসমর্পণের বদলে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নারী চরিত্রেরা অন্যায়ের প্রতিবাদে অনেক বেশি উচ্চকিত। অনিমাও নিজের মত করে গানের মাস্টারি, সেলাইয়ের দিদিমণি হবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দেয়।''[১২]

আরও কিছুদিন এভাবে কাটল। অনিমা কাজের সন্ধানে ঘোরার সময় হঠাৎ দেখা হল দুই বুড়ির সঙ্গে, তারা হলেন মানদা, যশোদা, অনিমার তারা পূর্বপরিচিত। মানদা-যশোদার সঙ্গে কথা বলার সময় অনিমা লক্ষ করল একটি গাঁটবাধা কাপড়। একপর একদিন তাদের বাসায় গিয়ে দেখে পড়া খবরের কাগজ দ্বারা কিছু সামগ্রী নকশা জাতীয় জিনিস তৈরি করে। দিন কয়েকের চেষ্টায় অনিমা সেই কাজ শিখে ফেলল। প্রথম প্রথম মানদা-যশোদার বাসায় গিয়ে কাজ করত। এরপর নিজের বাড়িতেই স্বামীর অজান্তে সেই কাজ করতে থাকে। অনিমার সামান্য আয় যদি নীরদকে সাহায্য করে এই ভাবনায়। সে বাঙালি গ্রামীণ নারী হয়ে থাকতে চায়নি। হয়ে উঠতে চেয়েছে শহুরে মধ্যবিত্ত নারী। একদিন রাতে অন্ধকারে নীরদ লক্ষ করল অনিমা বিছানায় নেই। নীরদ ঘুম থেকে উঠে দেখে একটি ঘরে রাতদুপুরে অনিমা কাগজের কাজ করছে। তার মধ্যে একটি নকশা মনে হলে কাপড়ে ফুটিয়ে তোলা কাঠগোলাপের মত।

> ''নীরদের নজরে আসে ঝাঁকার ভিতরে ঠোঙাগুলো রাখা আছে একটি বিশেষ আদলে। মনে হয় সে আদল কাঠগোলাপের। স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেনি। বরং জীবনের বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নকে মানিয়ে চলতে শিখে গেছে অনিমা। কল্পনায় অধরা কাঠগোলাপ ফুটেছে কাগজ বানানো ঠোঙার নকশায়। স্বপ্ন আর সাধ্যের মধ্যে আপোষ করে নিয়ে জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহ করতে শিখে নিয়েছে সে, চারপাশে ভিড় করে থাকা অন্য সব মধ্যবিত্ত মানুষগুলির মত।''[১৩]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পকে এতকিছুর পরেও লক্ষিত হয় আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যেই তাই তার সৃষ্ট চরিত্রেরা মহানগরকে স্বীকার করেছে। শত প্রতিকূলতা মধ্যেও ভালোবাসার স্বপ্নই তারা বুনেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রও সেকথা স্বীকার করেছেন। ''নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারাজীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সংকীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা, তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।''[১৪]

তথ্যসূত্র

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : গল্পমালা (১ম খণ্ড) 'গল্প লেখার গল্প', প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগষ্ট ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃ. ১০।

২. রূপে তোমায় ভোলাবো না গো, ভালোবাসায় ভোলাবো : জীবনশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উদয়চাঁদ দাশ (অন্তর্মুখ, বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব-৫, সংখ্যা-৪, ত্রৈমাসিক, এপ্রিল-জুন ২০১৬, পৃ. ২১।

৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : গল্পমালা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগষ্ট ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃ. ৯৫।

৪. তদেব, পৃ. ৯৯।

৫. তদেব, পৃ. ১০৬।

৬. তদেব, পৃ. ১০৭।

৭. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : গল্পমালা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগষ্ট ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃ. ৩২২।

৮. তদেব, পৃ. ৩২৩।

৯. তদেব, পৃ. ৩৩১।

১০. তদেব, পৃ. ৮২।

১১. তদেব, পৃ. ৮৮।

১২. অপরাজিত মধ্যবিত্তের লড়াই : নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কাঠগোলাপ' (নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, উজাগর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকা, দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪১৯, সম্পাদক - উত্তম পুরকাইত), পৃ. ১৭৮।

১৩. তদেব, পৃ. ১৭৯।

১৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : গল্পমালা (১ম খণ্ড) 'গল্প লেখার গল্প', প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগষ্ট ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃ. ১১।

কমল মাঝি
এম ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবাদের গল্প : নকশাল আন্দোলন

প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল

ষাটের দশকের মাঝামাঝি দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি গ্রামে সম্মিলিত কৃষকদের স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্‌গীত হয়েছিল, তাই মূলত পরিচিতি পেয়েছে নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে। অচিরেই এই জ্বলন্ত দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রান্তিকে। বিশেষ করে ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশের মত ঊষর দুর্গম গ্রাম অঞ্চলে। যেখানে মূলত সিংহভাগ মানুষ জন দারিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনজাতির মানুষজন। তথ্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতে হয় যে এই উক্ত আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের বছর দুয়েক আগেই। সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী (সিপিআই-এম) এর কর্মীরা, যা সিপিআই এম এর একটি বিরুদ্ধ গোষ্ঠী। এরা মূলত মাও সে-তুঙের আদর্শে বিশ্বাস করত সমাজ পরিবর্তন করতে হলে শ্রমিক কৃষকের সম্মিলিত অভ্যুত্থান অনিবার্য। শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র বিদ্রোহ যখন আছড়ে পড়বে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং সেখানে অনিবার্যভাবে পরাজিত হবে শ্রেণী শত্রু এই বুর্জোয়াতন্ত্র তবেই প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জাগরণ সমাপ্ত হবে। এই মতাদর্শে বিশ্বাসী চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী জঙ্গল সাঁওতালরা তাদের মতাদর্শগত আদর্শ দিকে দিকে প্রচার করতে থাকে। ঠিক এই রূপ পরিস্থিতিতে নকশালবাড়িতে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক মৃত্যু। ১৯৬৭ সালের ২৪ মার্চে নকশালবাড়ির এক অংশীদারি কৃষক যাকে অন্যায় ভাবে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। শুধু তাই নয়, তাকে ভূমিমালিক শ্রেণী তার সমস্ত আসবাবপত্র জোরপূর্বক কেড়ে নেয়, ও নির্দয় ভাবে প্রহার করার ফলে তার মৃত্যু হয়। এখানে দীর্ঘদিন ধরে ঘটে আসা শোষণ, শাসনে এমনিতেই চাষীদের মধ্যে ক্ষোভ পূর্ব থেকেই ধূমায়িত ছিল, এবার সেখানে আগুনে ঘৃতাহুতি হলো। সমস্ত শোষিত নির্যাতিত কৃষক সাঁওতাল আদিবাসিরা সম্মিলিতিভাবে স্থানীয় জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হল। জন্ম নিল দার্জিলিংয়ের পাদদেশে তরাইয়ের মাতৃভূমিতে 'নকশালবাড়ি আন্দোলন'। এ বিষয়ে অসীম চ্যাটার্জির পর্যবেক্ষণ হল—

> ''ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নির্ণায়ক রূপে দেখিয়ে দেয় যে, নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান আকস্মিক ঘটনা নয়, কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়।''[১]

নকশালবাড়ির সংগ্রাম ভারতীয় বিপ্লবের পথের মৌলিক প্রশ্নে দুটি লাইনের সংগ্রামের ফলশ্রুতি অতি দ্রুত এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের আগুনের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে দিক্ থেকে দিগন্তে। জন্ম নেয় তরাই এর বুকে নকশালবাড়িতে, নকশালবাদী আন্দোলন। আন্দোলনের প্রাক্-সূচনা লগ্নে এর অভিমুখ যা ছিল পরবর্তীতে তা কিন্তু বাঁক্ নেয়। একটি উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে এর পরিচিতি প্রাপ্ত হয়। যদিও নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে অনেক মতাদর্শগত ভিন্নতা রয়েছে সেটা একটা অন্যতম দিক।

আমরা অস্বীকার করতে পারি না নকশাল আন্দোলন তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে একটা নতুন আদর্শের জন্ম দেয়। ফলতঃ নকশালবাড়ি হয়ে ওঠে একটা আদর্শের নাম, একটি নবতর লড়াই এর নাম। যেখানে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর আদিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের ক্ষেভের বহিঃপ্রকাশ। ক্রমশ এই আন্দোলনের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মহানগরের বুকে। জড়িয়ে যায় অতি সাধারণ কৃষক, ক্ষেতমজুর, আদিবাসী থেকে শহুরে শিক্ষিত ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটা বিস্তৃত অংশ। এই

মণ্ডল, প্রকাশচন্দ্র : প্রতিবাদের গল্প : নকশাল আন্দোলন
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 42-47, ISSN 2249-4332

আন্দোলনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সরকার, নেমে আসে রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্র। রক্তাক্ত হয়ে যায় গ্রাম থেকে শহরের রাজপথ। প্রাণ হারায় অসংখ্য তরুণতাজা প্রাণ যারা এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করে। এই প্রেক্ষাপটকেই বেছে নেয় সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা। জন্ম দেয় নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোটগল্প। তাদের কলমে উঠে আসে নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক বহুমুখী চিন্তা-চেতনার নবতর রূপ।

সমাজজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আলেখ্য পাই সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। ষাটের দশকের এই অগ্নিগর্ভ প্রতিরূপকে অঙ্কন করলেন খ্যাতনামা সব গল্পকারেরা। গল্প শিল্পে জায়গা করে নিল এক নতুন অধ্যায়।

মীনাক্ষি সেন : মামিমা

নকশাল আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলি কিভাবে তরুণ তাজা স্বপ্নদর্শী যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল, কিভাবে তারা সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য থেকেও সমাজ বদলের স্বপ্নকে বুকে রেখে সংগ্রাম জারি রেখেছিল তারই এক জ্বলন্ত দলিল হল মীনাক্ষী সেন রচিত একটি ছোট গল্প 'মামিমা'। তরুণ যুবক রঞ্জু সমাজবদলের স্বপ্নে জড়িয়ে পড়ে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাঁর সহযোদ্ধারা নন্দিনী, জিতেন, গণেশ। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রঞ্জুকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিয়ে নন্দিনী পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর ভাড়া নেয় মামিমার কাছে। তার মা নেই, বাবা থাকে ধানবাদ। স্টপ ফেটে রঞ্জু অসুস্থ এ কথা বলে সে ঘর ভাড়া নিয়েছে। কারণ পুলিশ তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। মামিমা কি করে যেন বুঝে যায় রঞ্জু নন্দিনী যা বলছে সেটা ঠিক নয়। তবে পরম মমতায় নন্দিনীকে মামিমা আপন করে নেয়। মামিমা তাদের দৈনিক খোরাক দু'টাকার আটা থেকে তৈরি রুটি নন্দিনীকে খেতে দেয়। একদিকে ভি.আই.পি. রোডের ব্যস্ততম রোড এর উপর ব্যস্ততম মোড়ের মাথায় বাড়ি। কার কখন নজর পড়ে এ চিন্তায় রঞ্জু অন্যদের সতর্ক করে দিলেও ছেলেগুলি সে কথায় কর্ণপাত করে না। নন্দিনী ভাবে—

> "এক বেলা পেট ভরা ভাত, এক রাত্তিরের নিশ্চিন্ত ঘুমের জন্য পুলিশের গুলি আর জেলখানার ভয় মাথার উপর নিয়ে পাগলের মতো ঘুরছে সেই সব ছেলে, জলের মধ্যে মাছের মতো জনগণের গভীরে যাদের নিশ্চিন্ত বিচরণ করার কথা ছিল"।[২]

হঠাৎ করে একদিন সন্ধ্যাবেলা মামার সঙ্গে একটি ছেলে এসে বলে—

> "দিদি সটকে জান রুগী নিয়ে —
> মানে?
> মামুদের কাছে খবর হয়ে গেছে আমরাও রেডি...।"[৩]

ছেলেটি আরো জানায় সেও একদা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ফলে পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে মেরে খোঁড়া করে দেয়। তার কথায়—

> "তিনবার পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। বাবা ঘটিবাটি বেঁচে জামিন করালো। তার ওপর কি রাম প্যাদানি পুলিশের জানেনই তো, এখন শালা খোড়া হয়ে হাটি বেজন্মা গুলোর সঙ্গে বসে থাকি"।[৪]

এরপর নন্দিনী রঞ্জুকে নিয়ে লুকিয়ে নাইনিদের বারান্দার আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছে যায় ভি.আই..পি. রোডে। সেখান থেকে গাড়িতে করে পালিয়ে যায় হসপিটালে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সহমর্মি এক ডাক্তারের চেষ্টায় অবশেষে রঞ্জুর চোখ ভাল হয়ে যায়। তবে ধরা পড়ে যায় নন্দিনী, তার সাড়ে চার বছরের জেল হয়ে যায়। জেল ফেরত নন্দিনী অনুভব করে সব কিছু কেমন পাল্টে গেছে। দিনবদলের স্বপ্নগুলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে। সেই মামিমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। মামিমা তাকে বলে—

> "হ্যাঁরে, তুই যে চার বছর জেল খাটলি তা তোদের সে সবের কি হবে?"[৫]

জেল ফেরত নন্দিনীর কাছে এ প্রশ্নের উত্তর যে অধরা।

বারিদবরণ চক্রবর্তী : সবুজ দ্বীপের মাঝি

নকশালবাড়ির নতুন স্বপ্নের গনগনে আচ কিভাবে ছড়িয়ে গেছিল নদীয়া জেলার রানাঘাট এর সুখানিয়া গ্রামে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে বারিদবরণ চক্রবর্তীর 'সবুজ দ্বীপের মাঝি' নামক ছোটগল্পে। একই সঙ্গে এই গল্পে ধরা পড়েছে কমরেডদের মধ্যে অবিশ্বাস, যা প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লব আদর্শচ্যুত হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। কোলবিলে গঙ্গার চড়ে জেগে ওঠে এক নতুন চর। এই দ্বীপকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় অধিকারের লড়াই। এই লড়াইতে একদিকে আছে সম্পদের অধিকারী জোতদার, অন্যদিকে আছে জেলে মাঝি।

> ''নকুলের বাপ-ঠাকুরদারা সবাই গিয়ে কেঁদে পড়ল হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর কাছে; বলল এই কোলবিল তো গঙ্গার একটা দিশা হারানো দহ বই অন্য কিছু তো নয়, সেই রানী রাসমনির সময় থেকেই গঙ্গার নিঃশব্দ ভোগ দখলের অধিকারী জেলে মাঝি''।[৬]

খামোখা কেন মহাজন ব্যাপারীদের হাতে নির্যাতন পোহাতে হবে, দিন আমাদের হাতে দখলিস্বত্ব লিখে। বাস্তবে অতটা সহজ নয় এই দখলিস্বত্ব তুলে দেওয়া, কারণ সবটাই তো নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। অর্থাৎ সেই তেলা মাথায় তেল দেওয়া। স্বভাবতই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নকশাল আন্দোলনের নতুন স্বপ্নে শুরু হয় জোতদারদের সঙ্গে জমির লড়াই। পরিণতি স্বরূপ নকুলের বাবার প্রাণ দিতে হয় তারই সহকর্মী বিভাসের হাতে। নতুন স্বপ্ন দেখা এই মানুষ গুলির মধ্যে রং বদলিয়ে বেঁচে থাকে বিভাসরুপি মীরজাফররা। ঘটনাচক্রে দীর্ঘদিন পর নকুল তার পিতার খুনিকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও প্রতিশোধ নিতে পারে না। নকুলের বাপ ঠাকুরদারা যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিল সেই স্বপ্ন নকুল যে আজও দেখে। তাই নকুলের কথায়—

> ''আমি যে পারছি না— কিছুতেই পারছি না, সেই সবুজ দ্বীপটায় আপনার রক্তের দাগ লাগাতে আপনাকে নিয়ে কি করি বলুন তো''।[৭]

সাধন চট্টোপাধ্যায় : মুক্তিপণ

সত্তরের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলির গনগনে আঁচ কিভাবে নতুন তরুণদের প্রভাবিত করেছিল, তারা দিনবদলের স্বপ্নে নতুন প্রভাত আনতে চেয়েছিল সে কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। দু'চোখে-স্বপ্ন দেখা এই তরুণ তাজা প্রাণদের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করার নিমিত্তে তাদের উপর নেমে এসেছিল এক ভয়ংকর রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস। সাধন চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়কেই অতি সুচারুভাবে পরিবেশন করেছেন তাঁর 'মুক্তিপণ' নামক ছোটগল্পে। রাষ্ট্রীয় শাসন যাদের মাধ্যমে কায়েম করা হতো তাদের একজন হলো শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অতুল হলো সরকারি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার এক যন্ত্রবিশেষ। রাতের অন্ধকারে তার হাতের অব্যর্থ নিশানায় বলি হয়েছে একের পর এক তাজা প্রাণ। সে শুধু একজন অব্যর্থ শিকারি শুধু নয়, সে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পাষণ্ড। অতুলবাবু খালি হাতে কাউকেই সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে না। তাকে কিছু না কিছু উপঢৌকন দিতেই হয়। টাকা কড়ি গয়নাগাটি থেকে নারী শরীর। সে তার নিজের স্ত্রী পুত্রকেও রেয়াত করে না। দিনকে দিন অতুলবাবুর ব্যভিচার বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছালে, তার ছেলে প্রতিবাদ করে। পরিণামে তাকে শুনতে হয়— ''বেরোও শুয়োরের বাচ্চা''।[৮] অতুলবাবু এখানেই থেমে না থেকে ড্রয়ার থেকে লোডেড রিভলবার বার করে পুরনো দিনের গভীর রাতের গলায় বলে— ''পালা! চলে যা!''[৯] কোনোক্রমে তার ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে, অতুলবাবু রাত জেগে চেয়ারে বসে থাকে হাতে নিয়ে ছয় ঘড়ার পিস্তল। অবশেষে তার স্ত্রীকে কথা দিতে হয়, এরপরে অতুল বাবুকে তার ছেলে আর কিছু বলবে না। অর্থাৎ নিজের স্ত্রী পুত্রকেও সে খালিহাতে দয়া করেনি।

স্বপন চক্রবর্তী : রতনলাল

স্বপন চক্রবর্তীর 'রতনলাল' নামক ছোটগল্পে ধরা পড়েছে, নকশাল আন্দোলন, দেশভাগ, বাস্তুহারা জনজীবনের চিত্র। রতনলালের জন্ম বাসন্তীতে। যখন দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ছিল। চিন ভারতের যুদ্ধের জন্য গাঁ উজাড় করে ভূমিহীন চাষী পরিবারের ছেলেরা দুদিনের ট্রেনিং নিয়েই রাতারাতি সৈনিক বনে গেল রতনলাল এর মত বাস্তুহারা মানুষজন। এরা সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের নতুন স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে স্বপ্ন দেখেছিল তারা জমির সত্ত্ব পাবে, মাথা তুলে বাঁচবে। রতনলাল-এর পাশে লেখা হয় 'কমরেড'। ফলে রতনলাল এর বাড়িতে সার্চ হয়। রতনলাল স্বপ্ন দেখেছিল একদিন গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলবে। কিন্তু যেখানে বিষ্ণুচরণ-এর মত মিল-মালিক আছে সেখানে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে কেন? তাই নতুন স্বপ্ন দেখা এই রতনলালদের মত মানুষেরা রাতের অন্ধকারে এই পৃথিবী থেকে ঝড়া পাতার মতো ঝড়ে যায়। রতনলাল সামনের লোকটাকে ধাক্কা মেরে পালাতে যেতেই—

> "সে লক্ষ্য করলো লোকটা কখন যেন তার পেটের মধ্যে চাকুটা চালিয়ে দিয়েছে। দুই হাত দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরে ফুট ফর ওয়ার্ক এর রাস্তায়লুটিয়ে পড়বার আগে সে তীব্রভাবে চিৎকার করে উঠল মাস্টারদা।"[১০]

এভাবেই ভূমিহীন কৃষকদের স্বপ্ন দেখার নতুন জীবনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয় শিল্পপতি, জোতদার, জমিদার শ্রেণী।

মোহিত রায় : নামকরণের ইতিহাস

তরাই-এর নকশালবাড়িতে যে নতুন স্বপ্নের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা ক্রমেই ফুলে ফলে বিস্তারিত হতে থাকে। সেই আঁচ ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ল গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগরের রাজপথে। কলেজপড়ুয়া ছাত্র কিভাবে নিজেদেরকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল, তার কথকতা ধরা পড়েছে মোহিত রায়ের 'নামকরণের ইতিহাস', নাম ছোটগল্পে। কলেজ ছাত্র পৃথ্বীরাজ সত্তরের দশকের সেই উত্তাল সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারেনি আর দশটা যুবকের মত। সে জড়িয়ে পড়ে চাষীদের সঙ্গে লড়াইতে। সে এখন হাজার হাজার লড়াকু মানুষদের একজন। হঠাৎ করে একদিন খবর আসে—

> "কৃষকের ফসল রক্ষার সংগ্রামে শহীদ হয়েছে সে। পৃথ্বীরাজ আজ তাদের একজন যাদের মৃত্যু হিমালয়ের চেয়েও ভারী"।[১১]

দিন কয়েক পর পৃথ্বীরাজের পাড়ায় ছোট্ট সভা বসে। তার নামে তৈরি হবে শহীদ বেদী। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে বেদীতে কি লেখা থাকবে? যে নামে তাকে সবাই চিনবে। সেই নামকরণের জন্যই এই সভা। আসলে নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য দিকে দিকে গ্রামে গঞ্জে যে এক নতুন মহাকাব্য তৈরি হচ্ছে তার চরিত্রের এক নতুন নাম খুঁজছে তারই সহযোদ্ধারা। তাই গল্প শেষে লেখক এর মন্তব্য—

> "বিষ্ণুপদ, মলয়, স্বদেশের কবরের উপর নতুন ফুল ফোটার অপেক্ষায় কি নাম রাখবে তুমি পাঠক? আমি রাখবো কমরেড"।[১২]

এভাবেই শহীদ পৃথ্বীরাজ স্বপ্ন দেখানোদের দলে চিরকালের তরে নাম লিখিয়ে যায়।

মিহির ভট্টাচার্য : বাল্মীকির মা

কলকাতা শহরে থেকে অনেক দূরে নকশালবাড়ির নতুন স্বপ্ন কিভাবে কলকাতার বুকে বিটি রোডের পাশে রানী রোডের মোড় একদা কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী বহন করে মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা' ছোটগল্প। এ গল্পে আছে পুঁজিপতি শিল্পপতি রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্র। আছে এদের হাতে শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের ইতিবৃত্ত।

দেশভাগের গভীর ক্ষত নিয়ে পূর্বপুরুষ বিটি রোডের পাশে মুন্সীডাঙ্গা মাঠে বসতি স্থাপন করে। রতুর দাদু পূর্বে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হলেও দেশভাগের ক্ষত নিয়ে এখানে এসে একেবারে নিঃস্ব হতে হয়। বসতি গড়ে তুলতে হয় পতিত জমিতে। রতুর দুই মামা অমল আর বিমল সংসারের প্রয়োজনে মস্তানিতে ভিড়ে যায়। রতুর দাদু যা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই রতুর দাদু একবুক গভীর ক্ষত নিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—

> ''দাদু তুই আমার রত্নাকর। বল দাদু তুই মামাদের মত দস্যু রত্নাকর হবি না, বল তুই বাল্মীকি হবি।''[১৩]

ঘটনাক্রমে রতু তার দাদুকে দেওয়া কথা রাখতে পারেনা। সে জড়িয়ে পড়ে খারাপ সঙ্গে। ধীরে ধীরে মস্তানের দলে ভিড়ে যায়ে তার মামাদের মতই। পরে ঘটনাক্রমে তার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। তখন শহর কলকাতার আকাশে বাতাসে সে এক নতুন সুর শুনতে পাই। শ্রমিকদের পক্ষের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে রতু বুঝতে পারে যে রিফিউজিদের সঙ্গে দেশ নেতারা অন্যায় করছে। রতু লক্ষ করে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসায় নেতারা অনেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নতুন বহু কর্মী, নেতাদের অধঃপতন হয়েছে। এমতাবস্থায় দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের কোলে নতুন সূর্য উঠেছে। তার রশ্মিতে তারা সারা দেশকে আলোড়িত করতে চাইলো। সূর্যের ঠিকানার খোঁজে গোটা দেশের প্রান্তে প্রান্তে জীবন্ত মানুষেরা ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে, জলে-জঙ্গলে, ক্ষেতে-খামারে ছড়িয়ে পড়ল—

> ''তাদের গলায় আওয়াজ, সময় এসেছে এবার তৈরি হওয়ার।''[১৪]

সেই আওয়াজ রত্নাকরের মনের কন্দরে প্রতিধ্বনিত হলে সে বুঝতে পারল এই ব্যবস্থাকে না বদলালে দস্যু থেকে বাল্মীকি হতে পারবে না।

কিন্তু এ পথতো সহজ পথ নয়, এ পথে বিস্তর চোরাগলি। ফলে তাদের উপর নেমে এলো রাষ্ট্রযন্ত্রের নাগপাশ। শুরু হলো অত্যাচার, হত্যা। দিকে দিকে তরুণের দল-এর ছবি বেরোয়। কচি তরুণ ছেলেদের মৃতদেহের গঙ্গায় ভেসে যাওয়া লাশের দলবদ্ধ শবদেহের। এদিকে দিনের পর দিন রতু বাড়ি ফেরে না। মা ভাতের থালায় খেতে বসে খেতে পারে না। থালা নিয়ে চলে যায় বাড়ির সামনের বেদীতে। মৃদু স্বরে বলে—

> ''অ রতু, রতু রে, তুই কি বাল্মীকি হইতে গিয়া উই ঢিবির নিচে চাপা পইড়া গেলি?''[১৫]

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোটগল্প রচিত হয়েছে। এই ধারাটি বাংলা গল্প শিল্পে একটা অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। আসলে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগরের রাজপথে ছড়িয়ে পড়েছিল; ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের একটা বিস্তৃত অংশে। নকশালবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। স্বভাবতই নকশাল আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জনজীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। সামগ্রিকভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই প্রভাব সাহিত্যিক, শিল্পীরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করেছেন। যদিও নকশাল আন্দোলনের গতিমুখ পরবর্তীতে যে বাঁক্ নিয়ে ছিল, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়তো চলতেই থাকবে। তথাপি যে মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে এই আন্দোলনের উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল—তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

সূত্রনির্দেশ

১. নির্মল ঘোষ : নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৪৫।

২. বিজিত ঘোষ সম্পাদিত : নকশাল আন্দোলনের গল্প, পুনশ্চ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৫০৫।

৩. তদেব, পৃ. ৫০৭।

৪. তদেব, পৃ. ৫০৭।

৫. তদেব, পৃ. ৫১০।
৬. তদেব, পৃ. ২৮৮।
৭. তদেব, পৃ. ২৯২।
৮. তদেব, পৃ. ৩০২।
৯. তদেব, পৃ. ৩০২।
১০. তদেব, পৃ. ৩১০।
১১. তদেব, পৃ. ৫১৩।
১২. তদেব, পৃ. ৫১৩।
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৭।
১৫. তদেব, পৃ. ২৯৮।

সহায়ক গ্রন্থ

অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত : 'পদক্ষেপ', বইমেলা সংকলন, জানুয়ারি ২০১৮।
অনির আচার্য সম্পাদিত : 'সত্তর দশক' (দ্বিতীয় খণ্ড) অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯১।
আজিজুল হক : 'নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৯।
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'প্রতিবাদের গল্প নকশালবাড়ি', রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১।
মৃণালকান্তি মণ্ডল : 'কথাসাহিত্যের কিছু কথা' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, রথযাত্রা, ২০১৭।
শোভনলাল দাশগুপ্ত : 'স্বাধীন ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন রাজনীতির গতি-প্রকৃতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।

প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ, নদিয়া।

রিপোর্টাজের আলোকে ননী ভৌমিক

সঞ্জয়কুমার দাস

'রিপোর্টাজ' শব্দটির উৎসসন্ধানে পৌঁছে যেতে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-দশকে। পোল্যাণ্ডের 'দি ডেমোক্রাটিক জার্নালিস্ট' পত্রিকায় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পরিভাষাটি প্রথম গৃহীত হয়। তবে 'স্বাধীনতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলায় এ প্রকল্পের সূচনা। মুখ্যত বলা যেতে পারে, সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয়ই বাংলা রিপোর্টাজের প্রথম প্রবর্তক।

> ''রিপোর্টাজ শুধু তথ্য নির্ভর খবর নয়, সেই তথ্যের কাঠামোর ওপর যখন পারিপার্শ্বিক সত্যের, এমন কি কিছু কিছু জীবন্ত চরিত্রের রঙ চড়ে, তখনই তা শুকনো সংবাদ বিবরণের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। সাংবাদিকতায় এসে পড়ে সাহিত্যের মেজাজ।''[১]

বিশ্বসাহিত্যে জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' কিংবা জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' রিপোর্টাজ সাহিত্যের খ্যাতনামা দলিল। 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' বাংলা অনুবাদে বাঙালি পাঠকের এক প্রিয় গ্রন্থ। শ্লাঘনীয় বিষয়টি হলো, ননী ভৌমিকই সে গ্রন্থের অনুবাদক। গ্রন্থীয় অবয়বে পাঠকের হৃদয়হরণকারী 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিনে'র স্রষ্টা জন রীড পেশায় ছিলেন একজন খ্যাতিমান আমেরিকান সাংবাদিক। আর জুলিয়াস ফুচিকও একজন চেকোশ্লাভিয়ান সাংবাদিক। বিস্ময়ের কথা, 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' রিপোর্টাজ জুলিয়াস ফুচিক লেখেন কারাগারে বসে সিগারেটের প্যাকেটে। যা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অর্থাৎ কী জন রীড, কী জুলিয়াস ফুচিক উভয়েই ডাকসাইটে সাংবাদিক। তাঁদের সাহিত্যিক সত্তা, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পরেও এ কথা বলা।

সমান্তরালে বাংলা ভাষায় রিপোর্টাজ লিখিয়েদের প্রাথমিক পর্বে যাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁরা হলেন সোমনাথ লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, ননী ভৌমিক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীতে অকালপ্রয়াত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপোর্টাজ লিখে সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হিটলারের ন্যাৎসী-বাহিনী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেও অকুতোভয় জুলিয়াস ফুচিক কর্মে অবিচল থাকেন। এরপর তাঁর গ্রেপ্তার ও প্রহসনিক বিচারে ফাঁসির আদেশ বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর। ঠিক মাস পনেরো পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে বাংলা রিপোর্টাজের পথ-চলা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইলিয়া ইরেনবুর্গ, মিখাইল শোলোকভ, কবি কনস্তান্তিন সিমোনোভ প্রমুখের বিশ্বখ্যাত রিপোর্টাজকে পাথেয় করে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক-মজুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্ট বিরোধী একদল সাংবাদিক-সাহিত্যিক 'স্বাধীনতা'র কক্ষপথে আবর্তন করে ছড়িয়ে পড়েন বাংলার আনাচে-কানাচে। 'স্বাধীনতা' দৈনিকের পৃষ্ঠায় ছেপে বেরোনো রিপোর্টাজে মুগ্ধতার পাশাপাশি সত্যের নগ্ন রূপ দেখে শঙ্কা জাগে দেশবাসীর মনে। সেই রিপোর্টাজ লিখিয়েদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁর 'ভুবননগর এড়িয়ে' একটি বিখ্যাত রিপোর্টাজ। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের 'দুটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমি ইণ্ডিয়া' সাড়া জাগানো রিপোর্টাজ।

'রিপোর্টাজ'কে আজ আর সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। টি এস এলিয়ট সাংবাদিকতাকেও সাহিত্যের গোত্রভুক্ত করার পক্ষপাতি। আমাদের মনে হয় সংবাদের সাথে সাহিত্যের সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। 'কল্পনা' সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও সংবাদে তার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু লেখনি শক্তির প্রাচুর্যে ননী ভৌমিক এমন কিছু রিপোর্টাজের জন্ম দিয়েছেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, রিপোর্টাজের ফর্মকে তিনি ছোটগল্পের বুনিয়াদ

দাস, সঞ্জয় কুমার : রিপোর্টাজের আলোকে ননী ভৌমিক
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 48-54, ISSN 2249-4332

হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ধানকানা'র প্রথম গল্পটির কথাই বলি, তাহলে সেখানেও দেখব রিপোর্টাজের বস্তুগুণ। 'একটি দিন ১৯৪৪' একটি সার্থক ছোটগল্প, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যাবৎ সনাতনী ছোটগল্পের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যে বুনিয়াদ রচনা করলেন তাতে রিপোর্টাজের মাহাত্ম্য গুণ আছে যথেষ্ট। ননী ভৌমিক সংখ্যাতত্ত্বে ঠিক কতখানি রিপোর্টাজ লিখেছিলেন, তা বলা অসম্ভবপ্রায়। ননী ভৌমিককে বাংলা সাহিত্যের মূল আলোচনায় অন্তর্ভুক্তের কোনো প্রয়াসই গ্রহণ করেনি তাবড় তাবড় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। সর্বত্রই এক অনীহার বাতাবরণ। তবু 'কথারূপ' সম্পাদক গৌতম অধিকারী মহাশয় ও 'গল্পসরণি' সম্পাদক অমর দে মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের নিকট বড়োই শ্লাঘনীয়। অবশ্য সে শ্লাঘার সোপান প্রস্তুতের গৌরবকার 'উত্তরধ্বনি' সম্পাদক বীরেন-চন্দ্র মহাশয়। তন্মধ্যেও ননী ভৌমিকের রিপোর্টাজের তথ্যানুসন্ধানে 'কথারূপ' প্রশংসার দাবি রাখে। বলা যেতে পারে, রিপোর্টাজকে কেন্দ্র করে ননী ভৌমিকের আলোচনায় আমাদের একমাত্র সহায় 'কথারূপ'। 'কথারূপ'-এর সৌজন্যেই জেনেছি ননী ভৌমিকের লেখা সাতটি রিপোর্টাজের কথা। যে তালিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করছি—

ক্রম	শিরোনাম	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
১	দিনাজপুরের স্বাধীনতা সৈনিকের রায়	জনযুদ্ধ	১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
২	বর্ধমানের গ্রামে অপ্রকাশিত দাঙ্গার খবর	স্বাধীনতা	২২ মে, ১৯৪৬
৩	আধিয়াদের মুখের গ্রাম কাড়িয়া জোতদারদের বাঁচাইবার সরকারী সংস্থা	স্বাধীনতা	২৮ জুলাই, ১৯৪৬
৪	গৃহযুদ্ধে গৃহহারাদের জবানবন্দী	স্বাধীনতা	২৬ আগস্ট ১৯৪৬
৫	জলপাইগুড়ির গ্রামে	স্বাধীনতা	১৮ অক্টোবর ১৯৪৬
৬	বিক্ষুব্ধ ডুয়ার্স	স্বাধীনতা	৩ নভেম্বর ১৯৪৭
৭	গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে	স্বাধীনতা	২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭

এ প্রসঙ্গে বলি, উপরোক্ত সাতটি রিপোর্টাজের প্রকাশকাল জানান দিচ্ছে আরও কিছু রিপোর্টাজের ইঙ্গিত। এমন ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি গোলাম কুদ্দুস মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গোলাম কুদ্দুস মহাশয় জানান—

> "লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের ত্রাণশিবিরে গিয়ে শুনি, মুসলমানরা বলছে—যে হিন্দুরা তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাদের মধ্যে 'খোদা' আছেন। কী আশ্চর্য, হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যেও একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখেন ননী ভৌমিক, আশুতোষ কলেজের ত্রাণ শিবিরে গিয়ে। আমাদের দুজনের রিপোর্ট 'স্বাধীনতা'য় একই দিনে একই পাতায় ছাপা হয়।"[২]

অথচ এই রিপোর্টাজের শিরোনাম ও মূলপাঠ আমাদের সংগ্রহের অতীত। কেবলমাত্র একটি রিপোর্টাজের সম্পূর্ণ ভাষা আমরা পাঠের সুযোগ পেয়েছি 'কথারূপ' পত্রিকার সৌজন্যে। এ পর্বের আলোচনায় 'কথারূপ'ই আমাদের একমাত্র সঙ্গী।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি 'সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দিনাজপুরের স্বাধীনতা সৈনিকদের রায়' শিরোনামে লুক্কায়িত ইতিহাস জানান দিচ্ছে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসারতা। দিনাজপুর বিভাজন-পূর্ব ভারতবর্ষের এক জেলা। বিভাজনের ফলে দিনাজপুরের খণ্ডাংশ স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত হয় পশ্চিম দিনাজপুর নামে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে দুটি স্বতন্ত্র জেলার জন্ম। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নজরকাড়া কেন্দ্রে পরিণত হয়। কেননা—

> "১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন বাংলার নানা জেলায় শুরু হয়ে যায়। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, কাকদ্বীপ, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, যশোহর ছিল তাদের মধ্যে অগ্রণী।"[৩]

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও-এ তেভাগা কৃষক আন্দোলনের তীব্রতা ছিল বিস্ময়কর। নিজ খোলানে ধান তোলা, কর্জা ধানের সুদ না দেওয়া এবং আধিয়ার বাতিল করে তেভাগার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে দিনাজপুর। সুশীল সেনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান একই সারিতে দাঁড়িয়ে জোর প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলে। পিছু হটে রাজ প্রশাসন।

আবার ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে 'বর্ধমানের গ্রামে অপ্রকাশিত দাঙ্গার খবর'-এ গ্রাম বাংলায় ভয়াবহতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উঠলে আবশ্যিকভাবে মনে দোলা দেয় 'রশিদ আলী দিবস' বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর স্মৃতি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস-এর দিনে কলকাতায় শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, বিহার, গড়মুক্তেশ্বর (উত্তরপ্রদেশ) এবং পাঞ্জাবে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেদিন কেবলমাত্র কলকাতাতেই ৫০০০ মানুষ নিহত হন এবং আহত হন প্রায় ১০০০০ মানুষ। লক্ষ্য করার বিষয়, রশিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠার পূর্বেই বর্ধমানের গ্রামে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যা কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হলেও 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিক হিসেবে অকুতোভয় ননী ভৌমিক সে বিষয়ে কলম ধরেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ''মানুষ যখন মরে তখনও, মানুষ যখন মরে যাইনি তখনও। হাজার ঘটনায়, হাজার খবরে এই অবহেলিত অসহ্য একটা খবরই তুলে ধরতে চেয়েছে 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিকরা।''[৪] 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিক হিসেবে ননী ভৌমিকের অভিব্যক্তি—

> ''একদিন যখন আমায় বলা হল 'স্বাধীনতা'র সংবাদ সংগ্রহের জন্য যেতে হবে মফঃস্বলে, সেখান থেকে এমন খবর পাঠাতে হবে যা দু'কলম শিরোনাম দিয়ে ছাপা হবে সংবাদপত্রে, তখন কিন্তু উৎসাহের ফাঁকে ফাঁকে অস্বস্তিও বোধ করেছিলাম—আসলে হয়ত অন্যান্য পত্রিকাই ঠিক, আসলে হয়ত সত্যিই খবর নেই গ্রামে। সংবাদ? কি এমন আছে সংবাদ দেবার মত?''[৫]

ননী ভৌমিকের এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে, তারই কলম প্রসাবিত রিপোর্টাজে। 'আধিয়ারদের মুখের গ্রাস করিয়া জোতদারদের বাঁচাইবার সরকারি ব্যবস্থা' শিরোনামাঙ্কিত রিপোর্টাজটি প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই। 'আধিয়ার' প্রাক্-মুদ্রা যুগের কৃষি ব্যবস্থা। চাষি ও জমির মালিকের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উৎপাদিত ফসলের আধাআধি বন্টনই এই প্রথার সনাতনী নিয়ম। কিন্তু রায়তিস্বত্ব আইন (১৮৫৯), বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫), প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮), দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মুদ্রাস্ফীতি এবং সর্বোপরি অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আধিয়ার কৃষক ভাতে মারা পড়তে থাকে। ক্রমেই তারা আধিয়ার থেকে কৃষি মজুরে পরিবর্তিত হয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা শীর্ষদেশ স্পর্শ করতে থাকে। ঠিক এসময়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণসভা আধিয়ারদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন সরকার ভূমি রাজস্ব জনিত কারণে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গঠন করে ফ্লাউড কমিশন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ কমিশনের পেশ করা রিপোর্টে তেভাগার সুপারিশ করা হয়। আধিয়াররা সেদিন তেভাগার দাবিতে মুখর করে তোলে ভারতের আকাশ-বাতাস। কমিউনিস্ট মতাদর্শে আস্থাবান ননী ভৌমিক স্বভাবতই সমালোচনায় ব্রতী হন কৃষক শোষণের সরকারি ব্যবস্থার।

তাঁর 'গৃহহারাদের গৃহযুদ্ধ' রিপোর্টাজখানি প্রকাশিত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ আগস্ট। প্রকাশক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতে ধমনীতে বয়ে যায় বিভীষিকার চোরাস্রোত। কেননা এ রিপোর্টাজ প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্বে কলকাতার মাটি রক্তপ্লাবনে ভেসে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংস হত্যালীলায়। স্টেটমেন্ট পত্রিকায় যে হত্যালীলাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'Great Calcutta Killing' রূপে। ১৬ আগস্ট 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—

> ''আমরা বিশ্বাস করি যে কোন হিন্দুই এই সাম্রাজ্যবিরোধী উচ্ছ্বাসকে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে দিতে চান না। তাই আমরা আবেদন করি : উত্তেজনার বশে সেদিন যদি কোন মুসলমান জবরদস্তি করিয়া

বসেন, তবে ভাইয়ের ভুল ভাবিয়া উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, পরস্পর-বন্ধুত্ব ও সমর্থনের সাহায্যে সকল মলিনতা কাটাইয়া তাহাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবেন।''[৬]

কিন্তু এ আবেদনে সাড়া মিলল না। হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ল ক্রমেই। গৃহযুদ্ধে মেতে উঠল কলকাতা। গলি থেকে রাজপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল মৃতদেহের স্তূপ। নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিতে গৃহত্যাগ করল অনেকেই। মানিকতলার অন্তর্গত বাগমারীর কয়েকশো হিন্দু নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিল হিন্দু মহল্লায়। নৃশংসতা ও নির্মমতার চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল শোভাবাজারে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন কমিউনিস্টদের আহ্বান জানান, ''আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ হইতে কলিকাতার উন্মত্ত নাগরিকদের ফিরান।''[৭] 'গৃহহারাদের জবানবন্দী'তে ননী ভৌমিক লিখেছেন, ''রূপালি স্ট্রিটের বস্তি থেকে ছিটকে এসেছে একদল লোক। প্রথমে চল্লিশ জন ছিল তারা। কয়েকজনের খোঁজ নেই। কেউ তারা রিক্সা টানত, কেউ গাড়ি ঠেলত—দোকান দিয়েছিল কেউ।

বুড়ো মত একটা লোক বলল—দেশে পালিয়ে গেল; বহুৎ লোক দেশে পালাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ''পালাল কেন?''

উঁচু দিকে মুখ করে বলল—'কি করবে? দেশেই যাবে। না খেয়ে মরতে হবে এখানে—কি করবে? সাহু মহাজনের কাছে মেঙ্গে নিয়ে খাবে মুলুকে—জমি মালগুজারী কিছু তো নেই।

আরো কয়েকজন লোক মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সায় দিল বুড়ো লোকটার কথায়—কি করব, গরীব লোক আমরা .... কোনো আক্রোশ নেই তাদের কথায়। বিদেশী শহর কলকাতা। বিদেশী শহরের ভূতুড়ে সর্বনাশ থেকে তারা ফিরে যাবে মুলুকে।''[৮] ধর্মের নামে হানাহানিতে বিধ্বস্ত বাংলায় শান্তি ফেরাতে গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি প্রস্তাব ছিল—

> 'কলিকাতা এবং ঢাকায় এখনও হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পরস্পরের বুকে ছুরি মারিতেছে, পরস্পর পরস্পরের ঘরে আগুন জ্বালাইতেছে, আজও হিন্দু মুহল্লায় মুসলমান নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, মুসলমান মহল্লায় হিন্দু নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। এখনও সরকারি সৈন্য এবং পুলিশের পাহারায় ট্রাম এবং বাস চালাইতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এখনও অধিকাংশ স্থানের অবস্থা বাহ্যতঃ শান্ত হইলেও অবিশ্বাস, ভয়, আতঙ্ক, ঘৃণা এবং প্রতিশোধস্পৃহা হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আবার আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, খাদ্যের অভাব এবং অনাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কৃষকের পাটের দরও অস্বাভাবিকরকমে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি গৃহযুদ্ধ থামাইবার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টার অভাব রহিয়াছে, ইহা যে থামান যায় কিংবা ইহা থামান যে আমাদেরই স্বদেশবাসীর দায়িত্ব সে বিশ্বাসও আজ কদাচিত দেখা যায়।''[৯]

'স্বাধীনতা'র সাংবাদিক হিসেবে নির্ভীকচিত্তে সেদিন ননীবাবু কলম ধরেছেন মানবসেবার লক্ষ্যে। আবার 'জলপাইগুড়ির গ্রামে' এবং 'বিক্ষুব্ধ ডুয়ার্স' রিপোর্টাজদ্বয়ে ননী ভৌমিক তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের কৃষক-শ্রমিক মানুষের জীবনগাথা। স্বাধীনতার পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া ও বেরুবাড়ী—এই পাঁচটি থানার গ্রামে গ্রামে জোতদারকে আবর্তন করে কৃষকদের বাস। আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এইসব কৃষকরা জোতদারদের দয়া-দাক্ষিণ্যেই ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করত। তাদের নিজস্ব কোনো দাবি-দাওয়া বা অধিকার থাকা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না। কিন্তু দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি বর্ডারে কালীমেলাকে কেন্দ্র করে গরু-মোষ বিক্রির লেখাই খরচ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে সেই সকল কৃষকেরা কর্জাধানের বেআইনি সুদ, জেল বোঝাই আন্দোলন, আকালের বিভীষিকা, বাংকুয়া আইন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তেভাগার দাবিতে সোচ্চার হয়। অবশেষে দেবীগঞ্জের জোতদার সুরেন রায়ের জমিতে প্রথম ১০০০০ পুরুষ ও ৭০০ মহিলা মিলে তেভাগার দাবিকে বাস্তবায়িত করতে ধান কাটতে শুরু করে। রচিত হয় ইতিহাস। ব্রিটিশ পুলিশ-মিলিটারি অন্ততঃ

মাস সাত-আটেক দেবীগঞ্জ থানার কোনো গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স, চা বাগানময়। এখনকার চা শ্রমিকদের জীবন ছিল ক্রীতদাসদের মতো। ডুয়ার্স বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে রেল শ্রমিক আন্দোলনে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে B.A. Rail Road Workers Union গঠিত হলে শ্রমিকদের পাশাপাশি চা শ্রমিকরাও সংঘবদ্ধ হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ডুয়ার্সের মালবাজারে এক বিরাট প্রকাশ্য সমাবেশে পৃথকভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। যে সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে দেবপ্রসাদ ঘোষ ওরফে পটোল ঘোষ এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ। তেভাগা আন্দোলনের সুরে সুর মিলিয়ে চা শ্রমিকরা গর্জে ওঠে। তাদের জোরালো দাবি, 'বিলেতি মালিক লণ্ডন ভাগো'[১০]। মালিকপক্ষ ধনী হওয়ায় পুলিশ-প্রশাসন ছিল তাদের হাতে, অর্থব্যয় করে আইনকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শোষণের সীমা অতিক্রম করলে লক্ষ্মীপাড়া বাগানে ম্যানেজারের কুঠিতে আক্রমণ চালায়, কুঠিতে ভাঙচুর করে। ভেঙে ফেলে ম্যানেজারের মোটরগাড়িও। মিথ্যে কেস দিয়ে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু তেভাগার দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সমগ্র জলপাইগুড়ি। ঠিক এই সময়েই 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিক হয়ে ননী ভৌমিক ডুয়ার্সে আসেন এবং কমরেড দেবব্রত ঘোষের সাথে ননী ভৌমিকও গ্রেপ্তার হন। তেভাগা আন্দোলনকে ছত্রখান করতে ব্রিটিশ প্রশাসন জারি করে ১৪৪ ধারা। ননী ভৌমিক যে দৃশ্যকে প্রকাশ করেছেন 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে' রিপোর্টাজে। রিপোর্টাজটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। সেখানে ননীবাবু লিখেছেন—

> ''আমি তখন ডুয়ার্সে। হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারি হল সেখানে। অকস্মাৎ গ্রেফতার করা হল আমাকেও। এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে মোটরে তুলে ডুয়ার্স থেকে সোজা জলপাইগুড়ি। রবিবার কোর্ট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হাকিমের বাড়ি থেকে সই নিয়ে রাত দশটায় একেবারে পুরে দেওয়া হল ঘুমন্ত জেলখানার কুঠুরীতে।''[১১]

বস্তুত 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে' রিপোর্টাজটিকে ননী ভৌমিকের সাংবাদিক জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। রিপোর্টাজটির পাঠবস্তুতে জ্ঞাত হই 'স্বাধীনতা'র সাথে ননী ভৌমিকের সম্পৃক্তির ইতিবৃত্ত। মূলত গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার লোকায়ত ভাষাকে সভ্য সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার অভাবজাত ক্ষতিপূরণ করতেই তাঁর সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ। ধান-চালের দর, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রাভাব, আত্মহত্যা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীভৎসতাকে পাঠকের দরবারে হাজির করার আমন্ত্রণ পেলে ননী ভৌমিকের অভিব্যক্তি—

> ''এই অবস্থায় একদিন যখন আমায় বলা হল 'স্বাধীনতা'র সংবাদ সংগ্রহের জন্য যেতে হবে মফঃস্বলে, সেখান থেকে এমন খবর পাঠাতে হবে যা দু'কলম শিরোনাম দিয়ে ছাপা হবে সংবাদপত্রে, তখন কিন্তু উৎসাহের ফাঁকে ফাঁকে অস্বস্তিও বোধ করেছিলাম—আসলে হয়তো অন্যান্য পত্রিকাই ঠিক, আসলে হয়তো সত্যিই খবর নেই গ্রামে। সংবাদ? কি এমন আছে সংবাদ দেবার মত?''[১২]

'পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন'-এ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যেমন গ্রামীণ মানুষের হাল-হকিকত প্রকাশ করে আপাত কথিত সভ্য মানুষদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা ঠিক তেমনই মফস্বলের নজরকাড়া সংবাদকে 'স্বাধীনতা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে বিস্ময় জাগিয়েছেন ননী ভৌমিক। বিস্ময় জেগেছে পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের মনে। শহুরে নাগরিকদের মনেও।

> ''স্বাধীনতা'র মফস্বল-সংবাদে সেদিন সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। অন্য সংবাদপত্র তখন হয় স্তব্ধ—না হয় এক বিকৃত সংবাদ হাজির করছে মাঝে মাঝে। সংবাদপত্র তার দায়িত্ব না মানলেও সাংবাদিকরা মেনেছিলেন।''[১৩]

ননী ভৌমিককে একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসেবে প্রতিপন্ন করি যখন তিনি বলেন 'রক্ত আর মৃতদেহের দুই পাশে আমরা ভিন্ন জাতের লোক। নিরক্ষর বুনো ওঁরাও আধিয়ার একদিকে, আর অন্যদিকে শিক্ষিত পাঠকদের জন্য

এক সংবাদ লেখক। তা সত্ত্বেও কেমন একটা তীব্র সার্থকতা অনুভব করেছি সে দিন—সংবাদদাতা হিসেবেই।''[১৪]

তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামে আধিয়াররা যেভাবে তেভাগা দাবিকে বাস্তবায়িত করতে মরণপণ লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল, সেই সকল আধিয়ারদের বীরগাথাকে, তাদের জীবন সংকটকে সংবাদপত্রে তুলে ধরে ননীবাবুরা সেদিন সাংবাদিকতায় পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। চিরবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত, অসহায় মানুষগুলির মুখের লবজ্ মুদ্রণ সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়েছে। ৪৬-এর দাঙ্গা যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে শ্লথ করার নেশায় বুঁদ তখন উত্তরবঙ্গের তেভাগা সৈনিকদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চোখে ধরার মতো। একথা অস্বীকার করা সমীচিন নয় যে, দাঙ্গার বীভৎসতাকে রুখে দিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্‌মুহূর্তে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তে রেগুলেটরের কাজ করেছিল তেভাগা সংগ্রাম। স্বাধীনতার সেই সংকটময় উত্তাল পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে ননী ভৌমিকও সেদিন ছুটে বেড়িয়েছেন উত্তরবঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। নিঃসংকোচে মিশে গেছেন প্রান্তিক আদিবাসী মানুষগুলোর সাথে। তাদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে চেয়েছেন, পেরেছেনও। তাই উত্তরবঙ্গ ছেড়ে মহানগরে ফেরার পর যখন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে সংবাদে স্তম্ভিত হয়েছিল প্রান্তিক মানুষজন। ননী ভৌমিকের কথায়,

> ''খবর বেরলো একদিন। সে খবর পড়তে পারে না কেউ। কিন্তু খবরের সঙ্গে ছবিও বেরিয়েছে—মর্গের ভিতর উলঙ্গ বিকৃত কয়েকটা মৃতদেহের ছবি। হাসপাতালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা গুলি খাওয়া ওঁরাও কিশোরের ছবি। পরপর দুইবার নৃশংস গুলিতে তাদের যেসব সাথী মরেছে তে-ভাগা লড়াইয়ে, তাদের চেহারা, তাদের পিকচার।
>
> .... তাহলে যে রিপোর্টার কমরেড এসেছিল এখানে, সে তো তাহলে বেঁচে আছে। আমাদের তো ভোলেনি।''[১৫]

'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে' সহ অন্যান্য রিপোর্টাজগুলি পাঠের পর ননী ভৌমিককেও ভোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভবপ্রায়। তাঁর ভাষা শব্দ, চয়ন, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ এবং মানুষের সাথে মিথে যাওয়ার গুণে রিপোর্টাজগুলি হয়ে উঠেছে তৎকালীন সময়চিত্রের এক একটি ক্যানভাস। আর সাংবাদিকতার নিপাট গদ্যের নির্মাণকার থেকে ননী ভৌমিক পর্যবসিত হন শিল্পীর সরণিতে। এখানেই তার সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১. চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ, 'সাংবাদিক হতে গেলে', পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রা.লি., ৯ এন্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৪৯।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 'ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় (সংশোধিত ও পরিমার্জিত) প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১০৩।

৩. ধর কৃষ্ণ, 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ১০২।

৪. অধিকারী, গৌতম, কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই, কথারূপ, ৫৯ শ্রীমা রোড, ৩য় তল, কাঁঠালতলা, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা ৭০০০৬৫, সপ্তম সংকলন : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩২৪।

৫. তদেব, পৃ. ৩২৪।

৬. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৭, পৃ. ১৮০।

৭. তদেব, পৃ. ১৮৮।

৮. তদেব, পৃ. ১৯৭।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 'ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় (সংশোধিত ও পরিমার্জিত) প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৫।
১০. রায়, ধনঞ্জয়, 'তেভাগা আন্দোলন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুন ২০১৭, পৃ. ২০১।
১১. অধিকারী, গৌতম, কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই, কথারূপ, ৫৯ শ্রীমা রোড, ৩য় তল, কাঁঠালতলা, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা ৭০০০৬৫, সপ্তম সংকলন : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩২৯।
১২. তদেব, পৃ. ৩২৪।
১৩. তদেব, পৃ. ৩২৮।
১৪. তদেব, পৃ. ৩২৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৩২৯।

সঞ্জয়কুমার দাস,
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

A Brief Revisit on the Issue of Caste in West Bengal : Historical Relevance from Antiquity to the Present

Biswajit Haldar

ABSTRACT :

After 2011 assembly elections in West Bengal and ascendancy of Trinamool Congress in state power, scholars have expected a rise of new identity politics with regard to caste. They have seen the regime change as a decline of "Political over Social" ideology practiced by CPI(M) led Left Front for 34 years. They have concluded that caste has come upfront from under the veil to become a potent category in politics and may herald identity politics in West Bengal. In this article, firstly, I have tried to place this debate in perspective and tried to find an alternative explanation on the relevance of caste while conforming to their conclusions partially. Relevance of caste needs to be studied in three spaces (social, political and economic) keeping in mind the interdependency among them. I have taken the domain of politicsonly in this study and looked for the relevance of caste in its political manifestations at a time point of shift in ideology under democracy. Secondly, as Caste as a system is rooted in history, I referred to its origination, growth and maturity under different ideological regimes in the past to have a comparison with the present. The study asserts that caste exists today not as a system as it were in the past but as distinct categories devoid of any hierarchy. And recognition of MotuaMahasangha by competing political parties irrespective of ideology as a vote bank can only be seen as a sign of identity politics not a proof.

Introduction:

In 21st Century, before embarking on the question of Caste System and socio-economic transformation of different castes within the system in a particular geographical context, one must face an objective question as "Does caste as a system exist in that geographical context today?" If the answer is yes then it must have a basis, one must substantiate the answer with logic and supporting information. Secondly, one needs to be clear about the terminology "Caste System". There are definitions of "Caste System" propounded by the scholars for analytical purposes. I will come to that later. So,when we accept caste system still exist, there are associated questions to be answered. The following questions can come immediately to one's mind: When was the system come into being? Does the system separate people or unite people? Is the system hierarchic? Is it natural or cultural ? Did it remain unchanged in form

Haldar, Biswajit : A Brief Revisit on the Issue of Caste in West Bengal : Historical Relevance from Antiquity to the Present

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 55-67, ISSN 2249-4332

and nature over time? Did the system affect peoples' social, political and economic lives? Is it a hindrance to economic progress? Does it compromise with social justice? Is it efficient in strict economic sense? ……the list of questions will be long. However, we can ask these questions to any individual belonging to that particular geographical location in a field survey. Now looking at the questions one can understand that to answer them one needs to have prior basic understanding on History, Politics, Sociology and Economics.

An imaginary individual having *a priori* knowledge would response :

"Caste as a system was initiated in later Vedic period (800 BC?). Yes, it separates people in the categories of *Varna* (a fourfold system). It first separates people and then arrange them in a hierarchic order following the sacred Texts. Therefore, it is not natural but cultural. The system did not remain unchanged. How did the change come about is difficult to answer, there are so many arguments like abolition of untouchability, modern education, urbanization, constitutional safeguards, reservation, etc. Whether caste system compromise with social justice is difficult to comment. In addition, I do not really understand the question of economic efficiency…how it is related with caste system. However, reservation definitely undermines efficiency.Reservation must be on the basis of economic status…not on the basis of caste."

If we have a cursory check of the response given above, we can form hypotheses as under:

(a) Caste is relevant even today.
(b) Caste hierarchy had undergone changes.
(c) Abolition of untouchability,modern education,urbanization, constitutional safeguards, reservation are effective way of withering caste hierarchy.
(d) Reservation undermines efficiency.
(e) Caste hierarchy undermines efficiency.

Individual perceptions might carry bias. Individual knowledge at a particular point in time is limited and only continuous thriving make the understanding dynamic. However, for that we need workable hypotheses, a defined space and time.

In this particular study, I will treat one hypothesis: Caste is relevant today. My chosen space is West Bengal.

The ideological shift :

West Bengal with its history of a quarter of a century went through different ideological regimes. Since independence in 1947 till 1977 West Bengal had been ruled by the Congress Party and Left Parties were at the opposition. In 1977, the Left Front came in power and after 34 years of rule gave in to Trinamool Congress in 2011. All these governments are claimed to be secular and do not believe in any form of discrimination with respect to religion, caste, gender etc. I must recall a comment made by the first LF Chief Minister of Bengal Mr. Jyoti Basu (1980),

"*Caste as legacy of the feudal System and viewing the social scene from*

casteist angle is no longer relevant for West Bengal".[1]

This comment at first cursory look may reveal that as a head of the government, Jyoti Basu was denouncing the relevance of caste but instead, he put through his ideological position ofviewing the social scene not through the casteist angle but through the class angle. Class Struggle alone can bring about socio-economic transformation. In west Bengal class politics apparently subsumed caste politics (Sinharay, 2012)

Now I must recall another Quote ofMamata Banerjee (2009) after the good show in 2008 panchayat election in West Bengal. She is quoted as saying :

> *"I shall work for the Motuas as long as I am alive.I was moved when Baro Ma told me how her people being looked down upon as most of them belonged to lower castes.I do not believe in casteism and have no problem if people call me low-caste.I have instructed the railways to fill up all posts for SC-ST immediately"*[2]

So there had been two ideological shifts in West Bengal politics, one in 1977 and the other in 2011. In the first one, caste is not regarded as a political instrument required for socio-economic transformation while in the other an overt recognition of a particular caste (*Namasudra* in the sense) and its problems of social status which in turn depending on citizenship status. See another important point in the quote that posts belonging to SC-ST in government departments allegedly not filled up in due time is addressed by Mamata Banerjee and at that same time she used it as an electoral trick over her political rivals.

The Recent Debates on Caste Relevance in Bengal : West Bengal Assembly Election, 2021

Before the Assembly Elections in West Bengal,2021 many political analysts and journalists in have predicted that lower caste Hindu support this time is going to favour Bharatiya Janata Party and there are chances of a shift in ideology. Kumar (2021) opines,

> "Thespectre of identity Politics is haunting West Bengal. Unlike in the past, the ongoing identitarian electoral pitch by the two main contenders for power TMC and BJP has started resembling the political rhetoric of other states undermining the claim of Bengali exceptionalism.The latest example is the competing promises to include the *Mahishyas*, along with three more castes in the OBC list. Mamata Banerjee accused BJP of Copying from the TMC manifesto the idea of extending reservation to these backward Hindu castes."

Kumar (2021) used a phrase called "Subaltern Hidutva" as a process by which BJP has been successfully mobilizing lower caste support in its favour. I donot have scope to enter into any greater detail here as I just want to point out that competing ideologies regarding castes were not part of a hierarchic system of past but as distinct and separate categories.

After the election result was published, Roy (2021) slighted the idea of subaltern-hindutva. To him, it was not due to the faith in Hindutva on part of the lower castes but due to a strategy

to bargain for the prime demand of citizenship expressed under the aegis of *Motua Mahasangha*.

My take from this is again that castes are not seenany more as a part of hierarchy. In this case again Roy (2021) took the case of *Motuas* and *Namasudras*, as separate and distinct categories. *Motuas* or *Namasudras* are in no way supporters of a Brahmanical society as they have struggled for their identities in colonial Bengal. The Whole accounts of their struggle are recorded in Sekhar Bandopadyay (2011).

Debates on Caste Relevance in Bengal : After the election, 2011

A debate on politics in West Bengal after a long ideological regime finally voted out of power in 2011 started. The debate centered around caste and its hitherto hidden relevance in West Bengal Politics. Sinharay (2012) argues, "the caste is no longer alien to the politics of West Bengal". The previous absence of caste as an argument in West Bengal political equations since independence, according to Sinharay (2012), is attributable to the secular public image of Congress in the initial years and then the class politics of left Front Coalitions for a prolonged period of more than three decades. He cited the particular example of *Motua* Sect's reassertion of its presence, which arose out of the indifference of the Left Front towards the caste question, the *bhadralok* dominance over its leadership and its non-cooperation with the Mandal Commission in the 1980s.

Chandra and Nielsen (2012) on the other hand, put emphasised on rethinking the proposition that caste did not matter to politics in West Bengal electorally or otherwise. He quoted from Partha Chatterjee (1997) and Sekhar Bandopadhyay (2011) in Support of his idea that the "disjuncture between *bhadralok* and its others is neither new nor irrelevant to understanding politics and society in West Bengal Today". Chandra and Nielsen (2012) are of the opinion that West Bengal is like any other parts of India in terms of socio-economic reality. Rather West Bengal is worse compared to those parts of India where movements against upper caste dominance over the lower caste groups and its Brahmanical safeguards posed serious challenges over the 20th Century. They quoted Aloysius, G (1998) "Upper consciousness is so dominant among the intelligentsia that little research has been done on the egalitarian aspirations emanating from the traditionally depressed communities". It seems that as physical labor exertion is a taboo among the *bhadraloks* (this particular consciousness is rooted in socio religious history) conducting rigorous field research on this is rare. Chandra and Nielsen cited anthropologists' account like Dayabati Roy (2012), Mukulika Banerjee (2010) to show the persistence of caste in local power relations, even under the Left Front. They have cited Arlid Ruud (1994) and Marvin Davis (1983) to show limited social transformation under Left Front regime and holds the society as one of "inequality hierarchy and rank, separateness and distinction". They have concluded, "If Anthropology is still the science that chases myth it certainly seems to have its work cut out in West Bengal.

The second response came from Bandopadhyaya (2012). According to the author,"any attempt

at understanding the presence of caste in West Bengal today calls for a contextualization of the problem by studying the History of Caste Politics in pre-independence united Bengal". She disagreed with Sinharay (2012) on the newness of caste politics in Bengal today but agreed with Sinharay (2012) and Chandra and Nielsen (2012) on the relevance of caste politics in West Bengal today. She additionally pointed out that not only in the apparently uninstitutionalized politics of people caste matters but even in the realm of formal institutionalized politics it matters. Substantiating her argument she cited the example of Bangiya Jana Sangha (1922) headed by Manindranath Mandal, a *Poundra-kshatriya* leader to create a counter hegemonic position against bhadralok politics.Bangiya Jana Sangha Stood Firmly with Ambedkar on the issue of a separate electorate. She cited the example of Jogendranath Mandal and his BPSCF (Bengal Provincial Scheduled Caste Federation) a branch of Ambedkar's All India Scheduled Castes Federation and BPSCF's role in 1946 elections (Sen,2012). Bandopadhyay echoed the same as Sinharay and Chandra-Nielsen on the role of Marxists as *bhadralok* upper castes occupying the leadership of the communist party and lower castes as its cadres. However, she did not regard *Motua Mahasangha* as an organized voice of *Namasudras* and furthermore she did not think the rise of *Motua*could be seen as one that would bring back caste in Bengal politics where it was banished in 1947 because the *bhadralok* politics played its role to split it into parts along the mainstream political divisions. To quote Bandopadhyay (2012)," it remains to be seen whether the different *dalit* castes can form their own platform and create space for an independent *dalit* politics here or whether they would continue to play into bhadralok hands".

The third response in this debate was provided by Partha Chatterjee (2012) in which Chatterjee holds Uday Chandra and Kenneth Bo Nielsen correct in drawing the attention to the relevance of caste in West Bengal Politics. In framing his argument, Chatterjee regarded Bengal Partition as a unique background. The political realities before and after partition needs to be understood in clear terms. Chatterjee regarded rise of upper caste Hindu dominance in colonial Bengal because of decline in Muslim nobility,colonial land settlements and adoption of English education by upper caste Hindus. However, in course of time rich Muslim peasantries came up in considerable numbers in the 1930s and 1940s in eastern and northern Bengal and after provincial autonomy of 1935, it was clear that Bengal would be governed by Muslim politicians. In Chatterjee's words, rising Muslim middle class posed a threat to the predominance of upper caste Hindus in the municipalities, universities, in the bar associations and elsewhere. Eventually majority among Hindus demanded partition of Bengal. Post 1947 had brought some long-term effects. According to Chatterjee (2012) the changes can be highlighted as under:

(i) Traditional rural life in East Bengal based on caste and communal relations gave way to urban refugee life based on common loss and struggle.

(ii) Refugee colonies tended to be roughly homogeneous by caste and district origin. Therefore, caste practice in rural society became a distant memory and not transmitted

to the next generations.

(iii) Question of caste remain relevant in the time of negotiating marriages.

(iv) Refugee movements in and around Kolkata led mainly by the upper castes.

So, whether in the government or in the opposition it was the upper caste Hindus all the way. During the Left Front decades social institutions became a mere extension of the political party, there was the complete dominance of the political over the social (Chatterjee,2012).

It is true that despite significant presence of lower caste population in West Bengal institutionalized caste politics is absent here. Most research articles while referring to caste politics in West Bengal refer to Matua Mahasangha (MM) as a symbol of caste politics though MM is a religious sect founded by Harichand Thakur (1812-1878). Later his Son Guruchand Thakur (1846-1937 formalized the doctrines of the sect to suit the needs of the emerging lower caste peasant community. Guruchand himself believed that "if the namasudras did not actively participate in politics, social power would continue to elude them. But their politics was to be of different nature; its prime objective would be to demand their legitimate share of the opportunities created by the colonial state, that is education, employment and political representation." (Bandopadhyay, 2008). Therefore, it is understandable why MM does not want to be in the politics we are conceiving of.Ayan Guha (2017) pointed out the limits of caste politics in west Bengal while referring to Sinharay (2012). MM is unable to mobilize all its members in favor of a particular political party. The reason behind is their primary demand of citizenship which resurfaced again following the Citizenship amendment Bill. So one might argue that they have to align with the party in power both at the centre and at the state.Secondly, MM or *Namasudras* are not the only SC categories in Bengal. There are other significant categories such as *Rajbanshi, Pods, Bauri, Bagdi* and *Chamars*. Obviously, there are demand mismatches between these caste categories. The lower castes are never dominant over any considerable geographical area of West Bengal in terms of numbers and landholding unlike the *Jats, Rajputs, Ahirs and Yadavs* in the North Indian states. (Ayan Guha, 2017)

The above debate gives us indication that politics in west Bengal had been dominated by upper caste groups irrespective of ideologies for various reasons. But the most ominous one being the "Political Over Social" practiced by the Left Front over a long 34 years rule. So, a shift in ideology in 2011 made the researchers to believe that there will be a new don to caste identity politics in West Bengal. Despite the limits to Caste identity Politics in West Bengal unlike the other north Indian states, caste remains relevant for vote bank politics of upper caste Bengali *Bhadralok*.

Now we will present a brief historical account of the evolution of the system of castes in Bengal since its embryo to locate the past relevance and to understand the difference between the two.

Bengal's Distant Past : Past Relevance of Caste

The caste and class base of Bengali Society today (Geographically a much wider area than Present day West Bengal) is not the same as it were in the past i.e. the base underwent transformation since the inception of the Bengali Society as Bengali Society. We can have social, historical accounts and anthropological accounts to trace the path of transformation under different ideological regimes (from liberal to conservative, from colonial to post-colonial). In doing that we will draw primarily upon Dr. Nihar Ranjan Roy's pioneering work "*Bangalir Itihas* (History of the Bengali People) published in Bengali in 1949. Roy on the basis of available historical contents has given an idea of ancient Bengal comprising of Pundra, Gaur, Rarh, Summha, Bajra, Tamralipti, Samatat, and Banga since earliest historical period till 600-700 AD (Hood, 1994, P.96 (the English translation of Roy). In the first half of 7th century AD, Sasanka was enthroned as King of Gaur and Gaur came into being as a unified state unit from mere an inhabited settlement under reign of King Sasanka. The importance of Gaur rose to such a height that continued through the Pal era till Sen-Barman Dynasty in 13th Century AD. However since the 8th Century AD Bengal became synonymous with three settlements Pundrabardhan (Pundra), Gaur and Banga. All other Settlements finally were subsumed in these three gradually. Pala and Sena Kings wanted to be identified as Kings of Gaur. Roy thinks that there was a conscious effort since the period of Sasanka to unite all settlements and to give it one name as Gaur. This conscious effort finally matured in the Pala and Senaera. Interestingly, Vanga till then existed as a competitor maintained its autonomy in its essence. Quoting from the book :

> "Vanga, scorned and slighted by the Aryan society and its culture and the name which lessened the dignity and prestige of the Sena kings." (Roy Ibid p. 97)

So, the effort to unite the settlements under one Gaur identity did not become fully successful. Bengal as Bengal did not happen in Hindu era rather "Vanga" became important in Pathan era and finally in the time of Mughal emperor Akbar the ancient Bengal comprising all mentioned settlements came to be named and campaigned as "Subeh Bangla" which matured into Bengal during the Colonial Period (Roy : Ibid 97)

Here one point which is important for my Study is (i) Gaur was centre or controlling point and it were the upper Castes who were at the Centre (ii) Gaur was the centre for Aryan culture and civilization whereas Banga was hated and neglected due to its non-Aryan nature. Dr. Roy (1949) tried to give a picture with necessary details on the basis of available historical contents spread over ancient texts, inscriptions, hereditary accounts (Kulaji Granthamala) and land records (Bhumi Pattoli), etc. He sketched the picture on logical grounds through accepting and rejecting the records objectively and thus created a narrative on society, culture, people, and occupation under changing circumstances until the end of the Sen-Barman Dynasty. From his accounts, we can have ample indications about the economic life of its people and how it revolves around the changing nature of social institutions eventually got so rigid and conservative putting an unsurmountable bar on socio-economic transformation of the society.

Caste and class Order in Ancient Bengal

According to Roy Indian Caste, order is a fusion of pre-Arian and arian-bramhanic culture and traditions. Before the establishment of an Aryan-Brahmanic State in Gupta period, the Brahminic religion, culture, caste order etc. did not get acceptance in ancient Bengal. Later on, there were continuous conflict between traditions and cultures at the lowest layer of the caste order and beyond. Non-Arians accepted a defeat in their political and economic struggle first but social and cultural defeat were not immediate rather gradual. Notwithstanding the defeat, in the lowest tier of the Bengali Society, one can find the Brahminic caste order loose and the prevalence of old pre-Arian order. Nihar Ranjan Roy has identified five stages of the caste pattern before attaining maturity in Sena period:

(i) Introduction of the Arianisation (Roy Ibid 167),
(ii) Gupta era. (Ibid 171)
(iii) Pala Era, (Ibid176)
(iv) Chandra and Kamboja regime (Ibid 182)
(v) Sen-Barman Era. (Ibid 184)

It is important to note here that in the last stage two dynasties Pala and Chandra declined and replaced by Sena and Barman dynasty. Pala and Chandra were Buddhists and Bengalis whereas Senas were Karnat Brahmans (later taken up the profession of Kshatriyas and were known as Brahmakshatriyas) and Barmans were kshatriyas from kalinga. Roy asserts that "In the context of Social history of the Bengali people these two facts are extremely important and their significance is far reaching. (Ibid 184)

Iused Roys account to serve a specific purpose just to show that from the beginning (Aryanisation) to the Sena-Barman Dynasty that the Brahminic caste order survived all conflicts with the old social order and became so pervasive that it established itself as a monopoly institution according to the desire and directives of the state. Brahminic religion, culture, and caste order had been flooding Bengal for 300 years through the Gupta Era and the flow was uninterrupted even in the Pala era (though the Pala kings were Buddhists) as the Pala kings were liberal and secular in their outlook. The Pala kings regarded Brahminic religion and culture as a larger synthesis of ideals but The Sen-Barman Dynasty denounced all other traditions and culture but the Brahminic order. "Brahmanism, its society and its caste system developed unchallenged, there been no recognition of of others ideal and systems" (Roy, Ibid 190)

So it can be in inferred from the accounts given by Roy in his pioneering work that Brahminic order reached its maturity by the following means :

(i) A win over the Non-aryans by dint of war (political and Economic)
(ii) Aryanisation (social and Cultural),
(iii) Using Caste order (religious)
(iv) Using State Power to safeguard the socio-religious institutions.

The above means created a Caste order, whichis obviously headed by Brahmins. Except the

Brahmins, all other castes are hybrid castes in Bengal and considered as Sudras. I will avoid the details of hybridization here. I will consider Dr. Roy's position that in ancient Bengal there were no Kshatriyas and Baishyas (Source: Brihaddharmapurana and Brahmabaibartapurana) (Roy, Ibid 194). The Brahmins have ordered all the hybrid castes in categories as (Uttam Sankar, Madhyam Sankar and Adham Sankar according to Brihaddharmapurana) and Sat-Sudra and Asat-Sudra according to Brhmabaibartapurana. We find 41 castes according to their occupations and they are graded according to the principle of purity and pollution*. Both the puranas mentioned castes which are absolutely polluting and outside the Brahminic four-Barna System i.e. they are the untouchables and constitute the fifth caste.

Economic Classes in Ancient Bengal : A brief Account (Roy, 1994)

Now we will turn to the economic classes during this period (from 600 AD to 1300 AD). The society in ancient Bengal was divided in economic classes too. The origination of these classes was dependent on social production and its distribution. The society was based on private property unlike primitive communist societies in the pre-historic phase. The sources of wealth was agriculture, artistry and trade and commerce. Agriculture and trade were the main sources of wealth. Right to private land and property were controlled by the state. Wealth producing classes did not have the distributive powers. Rather it was with the landed gentry and State. The state had more control over land and its produce and relatively lesser control over artistry and trade in terms of distribution of the social production. On the basis of three sectors there had been three classes and within each class there were tiers according to the production and distribution of the social output. However, there are people in the societies who do not produce wealth directly but of social importance. At one end the intelligentsia (educationists, scientists, artists, linguists, writers, priests, etc.) and at the other end the people in servitude (Rajak, Bauri, Bagdi, Hari, Dom, Chandal, Pod etc). These two classes do not produce food directly but according to Brahminic hierarchy, intelligentsia did consume more and people in servitude did consume less. Occupation or livelihood was caste based and caste was dependent on birth then it is not surprising that distribution had been controlled by superiority of caste and class. In this period, Caste and Class were synonymous with fewer exceptions.Not all the classes and sub-classes came into being suddenly rather they evolved as the societies progressed. With more complex social division of labourers there had been increase in the number of classes and Sub-classes (Roy Ibid 212, 213).

To have an idea on the class order in ancient Bengal Dr. Roy considered the available land sale and donation records (bhumi Pattoli)*, Charyapada, Brihaddharmapurana, Brahmabaibartapuran and the Smritisashtras).

Again, I will avoid details and mention only those classes who are present on land records (pattoli). Two classes are evident (i) Royal people (ii) Traders and Merchants. Besides them there are Brahmans, Mahattara, Kutumbin, Byabaharin* (5th Century AD to 7th Century AD). However, in the Bhumi Pattolis since 8th Century AD to 13th Century AD shows that the land

donation or sale is being advertised to all contemporary classes of that period. Important to mention here that During 5-7th century the pattolis did not have mentions of farmer classes but in 8th-13th century they were being mentioned. Dr. Roy explained the phenomenon as a result of shift in emphasis on land and agriculture away from trade and Commerce. There are ample evidences showing donation of land to the Brahmins throughout this period. These can be summarised as in the following table :

5th – 7th century	**8th – 13th Century**
Trade and commerce were the main activity	Bengal became dependent on agriculture following the decline of earlier trade and commerce.
Land and agriculture were becoming the main activity in 6th century.	Production relations are feudal.
Spread of Brahminical order in the late 7th century.	Few feudal lords (Mahamandalik, Mhasamanta) at one end and innumerable landless peasants on the other end and several layers of intermediaries in between them.
Artisans, Traders and Merchants were the dominant class	Creation of a well-defined and united state created in turn a definite class of govt. servants though divided further in hierarchic layers on the basis of role and relative importance to the state affairs.
Presence of intellectuals in the field of education, literature, religion etc.	Brahmins are also class divided. At one end the poor priest and on the other the richer royal priests and feudal lords in disguise of an educationist.
Bengal as a state was in a formative stage. So a definite class of government servants were also in formative stage though elite and non-elite class of govt. servants were mentioned in the records.	Landless labourers belonging to Madhyam Sankar or asat-Sudra, no mention of the untouchables, slaves (the lowest laboring classes in rank).
No mention of the lower classes in the available records though they definitely existed at that time.	In Pala period, the state could see the bottom of the pyramid but the Brahminical outlook in Sen-Barman period preferred not to look at the base where Chandals, Dom, Shabar, Malowere pushed with disdain.

Source: Roy, Ibid. pp. 226-229

The above discussion gives us necessary information about adjustments within the caste system effected by competing ideologies, economic practices and above all the by the state. It is important to note here that despite differences in ideologies the state was not a democracy. Therefore, there was no scope for depressed castes and classes to ventilate their grievances. No compulsion on part of the rulers to effect any change was there. Caste degradation and ascendancy used to be done at the whims of the rulers.

Let us have a look at the list of untouchables given in "Brahmavaivarta Puran". This text divided the hybrid Bengali castes in two groups as '*Sat*' and '*Asat*'sudras (a total of 36 castes). Untouchables were outside of this list. They were,

> *"Vyadhas (hunters), Bharas (occupation unknown), Kapalis (workers in crafts and agriculture), Kols, Kocas (aboriginal community), Haddis (scavengers), Doms (cremators), Jolas (weavers), Bagdis (Palanquin bearers, fishing and field labouring) Sarakas (probably Buddhist Shravakas), Vyalagrahis, Chandals and others."(Roy, Ibid 197)*

For a meaningful comparison, we need to keep the list of untouchables given in "Vrihaddharmapurana" here as under,

> *"Mallegrahis (the clowns), Kuravas (occupation unknown), Chandals (executioners), Bauris (field labourers), Taksas (stone engravers), Charmakars (tanners), Gattajivis (keepers of ferry stations, may be patanis), Dolabahis (Palanquin bearers, Duliyas or Dules), Mallas (Malos the fishermen)." (Roy, Ibid 195).*

These two lists gave us the caste names of the untouchables in the 13th century. In 2011 Census government also provided a list of SCs which contains 60 caste names applicable for West Bengal though their occupations are not specified. It might be the reason that they are not in the hereditary occupations fixed by caste system on the basis of four-fold Varnashram or in a single occupation. Nevertheless, one thing is certain that the untouchables listed in the Puranas in 13th Century are still have their names in the SC list in 2011 Census with fewer exceptions. There are names, which were not untouchables in 13th century (such as Suri, Poundra, Dhoba, Tiyaretc). List of Scheduled tribes (Census, 2011) have 40 tribes name applicable for West Bengal but we do not find them listed in the puranas which suggests that they could sustain their independence despite state sponsored Aryanisation or they were never included in the Hindu fold. Butit's not bad that today's democratically elected government recognizes that they exist which the Sena-Barmanas never thought of. They were unable to see the bottom of the social pyramid. Theses caste categories have existed in the past in scorn and slight due to a hierarchic system of interdependence. They exist now as well in scorn and slight but not due to caste hierarchy as it has been replaced by new hierarchies with respect to power and economics.

Conclusion:

Caste as a system was relevant in the past. Caste as distinct categories is relevant today. The fourfold hierarchy has never existed in Bengal. It is true that castes were tagged with hereditary occupations and as a rule; it was imposed on people in Sena-Barman dynasty who were not Bengalis. So, it's not a natural thing rather a cultural imposition by rulers from outside. Caste struggles during independence despite its limitations for the first time got a chance to enter into democratic political sphere. The different caste categories need to find their common class interests and assert in a cohesive manner as once they fought for separate electorate during independence.

Relevance of caste needs to be studied in three spaces –Social, Political and Economic, keeping in mind the interdependency between them. I have taken the domain of Politics only in this study and looked for the relevance of caste in its political manifestations at a time point of shift in ideology under democracy. As Caste as a system is rooted in history, I referred to its origination, growth and maturity under different ideological regimes in the past to have a comparison with the present. The study asserts that caste exists today not as a system as it were in the past but as distinct categories devoid of any hierarchy. In addition, recognition of *Motua Mahasangha* by competing political parties irrespective of ideology as a vote-bank can only be seenas a sign of identity politics not as a proof. To reinforce the assertion made in this study, we must extend it in the domain of Sociology and then in Economics in that order.

Notes:

1. Sinharay, Praskanva (2012)
2. Sinharay, Praskanva (2012).

References:

Aloysius, G (1998), *Nationalism Without a Nation in India*, Oxford University Press, New Delhi.

Bandyopadhyay, Sarbani (2012), 'Caste and Politics in Bengal', *Economic and Political Weekly*, Dec 15, Vol XLVII, No. 50.

Bandyopadhyay, Sekhar (2006), "Social Mobility in Colonial Bengal : The Namasudras" in Ishita Banerjee Dube (ed), *Caste in History*, Oxford University Press, New Delhi.

Bandyopadhyay, Sekhar (2011), *Caste Protest and Identity in Colonial Bengal: The Namasudras of Bengal 1872-1947*, Oxford University Press, New Delhi.

Banerjee, Mukulika (2010), "Leadership and Political Work" in Pamela Price and Arild Eaglesen Ruud (eds.), *Power and Influence in India: Bosses Lords and Captains*, Oxford University Press, New Delhi.

Chandra, Uday and Nielsen, Kenneth Bo (2012), The Importance of Caste in Bengal ,*Economic and Political Weekly*, November 3, Vol XLVII No. 44.

Chatterjee, Partha (2012), 'Historicizing caste in Bengali Politics', *Economic and Political*

Weekly, Dec 15, Vol. XLVII, No. 50
Davis, Marvin (1983), *Rank and Rivalry : The Politics of Inequality in Rural West Bengal*, Cambridge University Press.
Guha, Ayan (2017), Caste and Politics in West Bengal: Traditional Limitations and Contemporary Developments, 9(1)27-36: Sage Publications.
Kumar, Sajjan (2021): "How TMC has eased BJP's way in Bengal" Indian Express March 20, 2021
Roy, Dayabati and Banerjee, Partha Sarathi (2006): 'Left Front's Electoral Victory in West Bengal',*Economic and Political Weekly*, October 7
Roy, Nihar Ranjan (1994) : *History of the Bengali People*– a translation by John W Hood from the original Bengali "*Bangalir Itihas*" (Orient Black Swan Private Limited)
Roy, Rajat (2021), '*Biswaser Noy, Koushaler Vote'* edit page. Ananda Bazaar Patrika May19, 2021, a Bengali daily.
Ruud, Arild Engelsen (1994) : "Land and Power : The Marxist Conquest of Rural Bengal", *Modern Asian Studies*, 28(2) : 357-80
Sinharay, Praskanva (2012) : 'A new Politics of Caste', *Economic and Political Weekly*, August 25, Vol XLVII No. 34

Biswajit Haldar
Department of Economics & Politics,
Visva-Bharati, Santiniketan

Service to the Nation: Revisiting the Thoughts of Swami Vivekananda

"Move on, O Lord, in thy resistless path!
Till thy high noon o'er spreads the world.
Till every land reflects thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed!"

—Swami Vivekananda

Debashis Mazumdar

I. Introduction

The word 'service' to any social scientist at present would mean such activities that would help in changing the socio-economic conditions of human life by creating such output or utility (not measurable in real quantities) which can be valued in terms of money. Thus, we often speak of educational service, health service, banking and insurance service, transport service and so on. Economists also try to measure the economic progress of a nation in terms of the growth of the service sector, and it is assumed that the contribution of the service sector towards national output and employment would rise gradually with the economic progress of any nation. Thus, economically developed nations reveal much higher shares of their service sector in their national income and employment compared to the less developed and developing nations. However, despite such significant progress of the service sector in many countries over the last few decades, socio-economic inequalities within and between countries have not reduced to a great extent.

In this paper, an attempt would be made to review the economic progress of India in terms of the growth of her service sector over the last few decades and the nature of development gap that still exists between the developed and developing nations. The relevance of the unique concept of 'service' as propounded by Swami Vivekananda in mitigating the present growth maladies and facing the new challenges of millennium development, particularly in a developing country like India, would be taken into account within the scope of the present study.

II. Importance of Service Sector

Economists like Colin Clark, A.G.B Fisher and Simon Kuznets have shown that economic progress of any country is marked by a change in the occupational pattern in favour of the

Mazumdar, Debashis : Service to the Nation: Revisiting the Thoughts of Swami Vivekananda
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 68-79, ISSN 2249-4332

service sector as well as a change in the sectoral composition of the national income. In their study, they have indicated that the proportion of a country's labour force engaged in primary or agricultural activities declines and the proportions of those engaged in secondary (or industrial) and service activities increase gradually as the country climbs up along the ladder of growth from the status of a 'low-income country' to a 'middle-income country' and ultimately to a 'high-income country'.

Such changes in occupational structure are also accompanied by a similar change in the sectoral composition of the national income. It is observed that as any country moves gradually from the category of 'low-income country' to a 'high-income country', the contribution of the agricultural sector towards national income declines, while the contributions of the industrial and service sectors increase gradually. In fact, both primary (viz. agricultural) and secondary (viz. industrial) activities need adequate support from the service sector for their smooth operation.

This theory also receives strong empirical support from the development experience of middle-income and high-income countries of the world. For example, the share of employment in agriculture had been 37 per cent in UK and 70 per cent in USA in 1820. However, by 1998, this share had decreased to 2 per cent and 3 per cent respectively. The World Development Report (2008), published by the World Bank, shows that between 2002-04, about 35-50 per cent of the workforce of the countries such as India, Pakistan, China, Bangladesh, Sri Lanka, etc. remained engaged in the agricultural sector, while this percentage was only about 1.5 per cent in UK and USA. In case of India, the share of the service sector in India's Gross Domestic Product (GDP) increased from about 29.8 per cent in 1950-51 to about 58 per cent in 2016-17. On the other hand, the share of the agricultural sector in GDP declined from about 59.6 per cent to about 16 per cent during the said period (Rakshit, 2007; Economic Survey, 2017-18). One of the most interesting features of the Indian economy over the last two decades is the emergence of services as the dominant sector and main driver of GDP growth. It has been observed that about 66 per cent of India's GDP growth during 1995-2006 has been contributed by the service sector. World Bank (2004) calls this feature as "India's Services Revolution". However, the occupational structure of India has not changed much in favour of the service sector since a large portion (about 49 per cent) of the workforce still remains engaged in primary activities. This is particularly due to the low labour absorption rate in industrial and service activities in India. It also signifies poor labour productivity in Indian agriculture.

III. Extent of development gap

Now the question is whether such 'service sector revolution' has reduced the miseries of the downtrodden and the economically backward classes of India or whether such a triumph of the service sector in several countries, particularly in developed countries, has helped in reducing the development gap between the less developed and developed countries. One study shows that even during the post-reform period[1] in India, the percentage of under-nourished households in rural areas has increased from about 57.7 per cent in 1999-2000 to about 66.9 per cent in 2001-02. In urban areas, this percentage has increased from about 41.5 per cent to 51 per cent during the said period (Sanyal et. al, 2009). The Human Development Report (HDR, 2011), published by the United Nations Development Programme (UNDP), indicates that the percentage of population living below the poverty line (less than PPP $1.25 a day)[2] in India was about 41.6 per cent in 2009-10. It is apprehended that the incidence of poverty in developing nations along with India has been intensified during 2019-20. This is particularly because of a 'job-loss growth' experienced in these nations (Kannan & Raveendran, 2019). A recent study shows that unemployment rate in India increased from about 2.3 per cent in 2011-12 to about 6 per cent in 2017-18, and further to about 7.5 per cent during 2018-19. During the recent pandemic situation this unemployment rate sky-rocketed to 23.5 per cent in April 2020 (CMIE, April 2020). Though this unemployment rate has come down during the 'unlock period' but still it is higher that than the 2017-18 level. This higher unemployment rate would intensify the problem of poverty. It has been observed that several areas of the service sector (like hotel & tourism service, aviation service, entertainment service etc.) were hard hit and growing unemployment rate led to both 'income shock' and 'health shock' among the common people. As per the "Key Indicators: Household Consumer Expenditure in India" survey conducted by the National Sample Survey Organization (NSSO), the average monthly consumption expenditure by an individual fell from Rs 1,501 in 2011-12 to Rs 1,446 in 2017-18, showing a 3.7 per cent fall. In rural areas, the average expenditure on food items by an individual declined by about 10 per cent during that period [It is to be noted that the government of India quickly withdrew this report from their portal]. We know that the poverty rate is calculated on the basis of a cut off per capita consumption expenditure per month. Hence, such fall in average consumption expenditure per month would surely imply an increase in the incidence of poverty rate in India during that period.

Several studies have also indicated that the development gap between the developed and less developed countries has also increased over time. According to Easterlin (2000), the ratio of income between the richest and the poorest countries of the world in 1820 was

approximately 3:1. However, in 1999-2000, this ratio has increased to about 380:1. The study made by J. A. Ocampo and R.Vos (2008) shows that between 1820-2001, the per capita GDP of developed countries has increased by about 19-fold, while the countries of Latin America, Asia and Africa have experienced, on an average, an increase of 8.3-fold, 7.1-fold and 3.6-fold respectively in this regard. This study also shows that the ratio of the per capita GDP of India to that of the developed world (measured at constant prices) was about 0.44 in 1820 and it declined to only about 0.09 in 2002. The World Development Report (2011) shows that the average income per capita in High-income Countries was about PPP $ 36,473 in 2009 and this figure was about PPP$ 1,199 for the Low-income Countries. Thus, income disparity between countries has not shown any sign of convergence over time. Some recent studies, however, have indicated the indications of convergence in the growth rates of per capita income of the less developed and developed nations but there are unmistakable global divide along several indicator of human development (say, inequality in the distribution of income, poverty, gender-oriented disparity, health and nutrition etc.) [Mazumdar, 2016].

The share of the world's population living in extreme poverty decreased from 44 per cent in 1980 to less than 8.6 per cent in 2019; but despite significant progress in living standards, there has also been a severe polarization of income inequalities (WEF, 2020). The Social Mobility Index (SMI), as determined by the World Economic Forum (WEF), based on factors such as equity in access to quality health and education, social protection expenditure etc. shows that India's ranking (76th) in terms of SMI is far below compared to her neighbouring countries like Sri Lanka (59th) and China (45th); and our position is slightly better than Bangladesh (78th) and Pakistan (79th).

The 'Low-income countries' contain about 40 per cent of world population and receive only about 3 per cent of world income, while the 'High-income countries' contain about 15 per cent of world population and yet receive about 81 per cent of world income (Thirlwall, 2006). This feature of the world economy has been rightly described by the UNDP as 'gargantuan in its excess and grotesque in its human and economic inequalities'.

Such large disparities in income are paralleled by huge gaps in other indicators of well being. The HDR (2018) shows that the life expectancy at birth for the average people remains much higher in developed countries like Norway (82.3 years), Australia (83.1 years) or USA (79.5 years) compared to the less developed countries such as Democratic Republic of Congo (60 years) or Niger (60.4 years). Similarly, opportunities in education show huge disparities across nations. Educational attainment, measured in terms of mean years of schooling,

amounted to less than 4 years in countries like Niger (2 years) or Mozambique (3.5 years), but this was equal to or more than 12 years in developed countries like Norway (12.6years) or Switzerland (13.4 years). The quality of living is often measured in terms of the Infant Mortality Rate (IMR) per 1000 live birth and Maternal Mortality Ratio (MMR) per 100,000 live births. The IMR was found to be about 5, on an average, in developed countries during 2016, while this figure remained as high as about 72 in Congo, 51 in Niger or 35 in India. Similarly, the MMR in developed countries was as low as 5 in Norway, 6 in Australia or 7 in Netherlands in comparison with a very high figure like 553 in Niger, 693 in Congo or 174 in India in 2015 (HDR, 2018). It also reflects the pattern of gender discrimination in developed and less developed countries.

From the above analysis, it becomes clear that 'service sector revolution' in India and other countries has not contributed in any significant way towards reducing either the poverty trap in India or the development gap between the developing and developed countries.

IV. Swami Vivekananda's Concept of Service

The concept of service as propounded by Swami Vivekananda is completely different from what is discussed in the present socio-economic theories. By service, he meant not only ameliorative service, but also all types of social action for the all-round development and social welfare. The major point in his doctrine of service is that while rendering our service to common man, we must treat them as God, i.e., his doctrine of service is based on a simple but effective equation :

Man (*Jiva*) = God (*Shiva*)

Whatever may the advocation of a person, he or she should realize and understand that it is God alone who has manifested Himself as the world and other creatures. He is both immanent and transcendent. It is He who has become all diverse creatures, objects of our love, respect or compassion and yet He is beyond all these. Such realization of divinity in humanity leaves no room for arrogance or hatred. Any man having this realization, cannot have any jealousy or pity for any other being.

Now, what type of service did Swamiji want his people to render to the society and what type of training for workers did he visualize to implement that plan? In fact, Swamiji wanted (i) a selfless service particularly for the poor and backward sections of the people, (ii) provision of proper education and health facilities for those people through several charitable organizations, (iii) Expansion of such values and ideals which would help man in realizing his / her 'true self' and increase his/her self-confidence, (iv) Expansion of educational opportunities for the women with a view to empower them in expressing their own views, (v) Creation of a

group of volunteers, consisting particularly of young people, who would serve the poor and common people in a selfless manner considering the existence of God in every human being. Practical Vedanta, as emphasized by Swamiji, was the fulcrum of all the social activities in his action plan. In the words of Swamiji, "So, do your work, says the Vedanta. It first advises us how to work – by giving up–giving up the apparent, illusive world. What is meant by that? Seeing God everywhere. …..If a man plunges headlong into foolish luxuries of the world without knowing the truth, he has missed his footing, he cannot reach the goal. And if a man curses the world, goes into a forest, mortifies his flesh, and kills himself little by little by starvation, makes his heart a barren waste, kills out all feelings, and becomes harsh, stern, and dried-up, that man also has missed the way. These are the two extremes, the two mistakes at either end. Both have lost the way, both have missed the goal. So work, says the Vedanta, putting God in everything, and knowing Him to be in everything." (CW, Vol.2, p.149-150)

Swamiji believes that most of our miseries arise due to our ignorance regarding our true self. Philosophically, there are two different ways of looking upon the world. The negative way is to reject it considering it as an illusion (*Maya*) in the form in which it presents itself before us. However, the positive way is to look to its fundamental basis, the ultimate Reality which alone exists. In this positive approach, which Swamiji emphasized, we have a deification of the world as against the traditional negation of it (Swahananda, 2012). Both are true from different standpoints, but the deification of the world (that God lives in every creature) has a tremendous social value. On the one hand, such social activities with the worshipful attitude towards men as God would mean a socialization of the Absolute from philosophical standpoint. On the other hand, these activities have a tremendous impact on the creation of social goods which would help the common people to overcome not only their income poverty but also the poverty of their mind (their meanness). However, these selfless and voluntary activities are not reflected in our national income accounting since these works are not done in exchange of money. In fact, only those service activities which are provided in exchange for money (e.g. the banking and insurance service provided by the public and private sectors banks, the health and education service provided by different profit-making organizations, etc.) are included in our national income accounting. Thus, the expansion of such service activities may not ensure greatest benefit for the common people. It has been observed that, over the past few decades, particularly since early 1990s, the percentage bank branches in rural India has been declining continuously. This is particularly because of the fact that the private sector banks are reluctant to open their branch offices in rural areas because return from agricultural activities is uncertain (the farm output depends too much on the vagaries of

monsoon) and the poor farmers do not have enough assets that can be kept as mortgage while taking loan from the banks. Hence, 'service with a profit motive' should be progressively replaced by a 'selfless service' with utmost love and compassion for the common people. However, this is not expected from the enterprises which operate purely on profit-motive (though big corporate houses now emphasize on Corporate Social Responsibility). Hence, we require whole-hearted cooperation of some voluntary organizations and people with 'ignited' mind to achieve this goal.

Swamiji has indicated some beautiful ways of work process in his scheme of service to the nation. Firstly, while providing the service, one should not expect anything in return, i.e., one should remain 'unattached' from the fruits of such service. It implies the '*Karma Yoga*'. We should feel that in whatever field we are working, we should serve people with utmost sincerity and honesty. We should only carry out our responsibility sincerely; the fruits of all such works belong to the society at large. Swamiji says , "Do you ask anything from your children in return for what you have given them? It is your duty to work for them, and there the matter ends. In whatever you do for a particular person, a city, or a state, assume the same attitude towards it as you have towards your children – expect nothing in return"(CW, Vol. 1, p.59). Secondly, any such service work should be considered as 'worshipping of God'. This attitude or spirit may take some time to develop in any common man. It may develop step by step, say, from 'work and worship' to 'work as worship' and ultimately to a motivation of 'work is worship'. It is true that two opposing forces exist in every human being, viz. '*Aham*'(myself) and '*Nãham*' (not myself); the former reflects our selfish attitude while the latter signifies the selfless attitude. Such attitudes also exist in animals, e.g. the tigress which kills other animals would be ready to sacrifice even her own life for the protection of her own cubs. In his book 'The Selfish Gene', the British Biologist, Richard Dawkins has indicated that the human body is essentially selfish and this gives rise to selfishness in individual behaviour. Hence, we essentially require the training and learning of generosity and altruism (Ranganathananda, 2000). Swamiji believed that this selfishness can be reduced to a large extent through the realization of the spiritual dimension of human personality, and here lies the relevance of 'Practical Vedanta'.

In an inspiring poem, Swamiji wrote,

" … Everywhere is the same God, the All-Love,
Friend, offer mind, soul, body, at their feet.
These are His manifold forms before thee,
Rejecting them, where seekest thou for God ?

Who loves all beings, without distinction,
He indeed is worshipping best his God."

Swamiji coined the word '*Daridranãrãyana*', God in the form of the poor – and told us to serve these poor people. In his words, "Where should you go to seek God—are not all the poor, the miserable, the weak, Gods? Why not worship them first"? Thus, the major part of Swamiji's plan of action and service works centred around the eradication of mass poverty. The present day development Economics also emphasizes on these aspects of human development. Economist like Denis Goulet has indicated three important components of economic development. These are: (1) Life sustenance, (2) Self esteem and (3) Freedom (Thirwall, 2006). Thus, no country can be considered as fully developed if it cannot provide its people with such basic necessities of life as housing, clothing, food and minimal education. Self esteem implies a sense of self-respect. No country can be regarded as fully developed if its people do not possess the power to conduct relations on equal terms with other countries. On the other hand, the word 'Freedom' here implies freedom from three evils, viz., from want, ignorance and squalor. No person is free if he/she cannot choose; if he/she is imprisoned by living on the margin of subsistence with no education and skill. All these components of development were present in Swamiji's action plan in a more refined manner.

The Nobel Laureate Amartya Sen also believes that the entitlement to adequate income-generating assets, food, shelter, basic education, health care and other necessities of life determines the capability of a person. According to him, economic development should be thought in terms of an expansion in such entitlements and capabilities in any society. Swamiji also emphasized on capability building though in a different way. He emphasized more on generating self-respect and self-confidence among the common people through proper inculcation of value-based education so that they can themselves solve many of their own problems. He says, "The miseries of the world cannot be cured by physical help only…. Ignorance is the mother of all the evil and all the misery we see. Let men have light, let them be pure and spiritually strong and educated, then alone will misery cease in the world, not before"(CW, Vol.1, p.53). There are many instances where the village people have successfully completed different community development programmes out of their own initiatives after being disgusted with the bad services provided by the corrupt government officials. The Nobel Laureates like Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, in their book 'Poor Economics', have also shown that such initiatives would give better results if we can ensure proper representation and active participation of the underprivileged people (women, ethnic minorities, lower castes, landless poor etc.) in these community development programmes (Banerjee & Duflo, 2011).

There is no denying of the fact that the knowledge and skill that emerge through such

selfless service would surely add to the stock of human capital (in the form of educated, skilled, healthy and enlightened people) in our country over time. This, in turn, is expected to raise our national output. Since such activities are particularly targeted towards the upliftment of the backward and poor sections of the people, the earning capability of these people are also expected to rise. Though our economic planning has emphasized the concept of 'inclusive growth' or 'growth with equity', very little could be achieved in this direction. In fact, there are limits to economic analysis regarding inclusive approach. Non-economic factors like social norms, culture, beliefs etc. can have definite influence upon the level of inclusion or exclusion (S. Mahendra Dev, 2012). For instance, a simple cultural habit of some men in occupying the 'seats meant for ladies' in public buses in Kolkata would mean excluding females from sitting on bus seats. It is very difficult to change the mind set of these people through formal education or even through the imposition strict rules and regulations by the government. Here, at this crucial juncture, when sexual harassment of women in workplace or public places have become rampant, we feel the necessity of such education and expansion of moral values as desired by Swami Vivekananda.

Swamiji uttered several times the need for a band of motivated men and women who would come forward to extend their helping hand for the cause of social reform. He said, "A hundred thousand men and women, fired with the zeal of holiness, fortified with eternal faith in the Lord, and nerved to lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, will go over the length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising-up — the gospel of equality" (CW, Vol.5, p.15). Whenever we review and analyze the social unrest in our country as well as in other countries, we realize, against the mirror of Swamiji's thoughts, that most of such misdeeds occur either due to ignorance or a practice of little chauvinism among particular groups of people. However, we should not give up our hope and should take into account thousands of benevolent activities undertaken by hundreds and thousands of kind-hearted people (e.g. by the monks of Ramakrishna order throughout the world). Let me just cite one example: Raj Kumar Tiwari, an intellectually disabled young athlete of India, has won a gold medal in the 'Figure Skating Event' (a sport hardly known in India) at the Special Winter Olympics in Seoul (South Korea) the year 2013. His father is a street hawker selling hairclips on the roadside at Pahargunj area in New Delhi and earns only about Rs. 4,500 per month. So, it was difficult for Raj Kumar to afford regular practice at Gurgaon's Ambience Mall. However, his dream was fulfilled through the financial and moral support of a group of kind-hearted men in his neighbourhood (Times of India, February 7, 2013). So, we should follow such ex-

amples of zeal and compassion rather than the misdeeds of another group of people in New Delhi or in other regions. We can also cite the example of great service provided by Swami Vivekananda, Swami Sadananda, Sister Nivedita and several other monks of Ramakrishna Order in nursing the plague affected poor people of Kolkata during 1898-99 when thousands of people fled from this city to save their lives. Swamiji was even ready to sell the landed property of Belur Math to finance that service programme.

V. The challenges ahead

In the year 2013 our country has celebrated the 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda through several functions both at government and private levels. However, if we celebrate this type of great event just for celebration sake, the whole effort would end up in a fiasco. We should realize the basic problems faced by our society, viz., the problems of short supply of man with bold character and broad heart to undertake a selfless service work for the down-trodden. I personally feel that even our perennial problems of poverty, ignorance, gender discrimination etc. can be reduced in an effective way (not merely in terms of statistical figures) if we can first ensure the smooth supply of a 'complete man'. If we try to reshape ourselves keeping the ideals of Swamiji's teachings, it would surely help us to come out of our little self and help us to realize our true personality. This will certainly change our attitude towards work as well as towards our fellow workers (Ghosh, 2006).

Finding solutions to the complex social, economic, infrastructural, political and poverty-related problems is indeed a great challenge. There is no doubt that facing such challenge needs enormous energy, a fresh perspective, a grandiose vision and superhuman effort. At this phase, we must find out ways to motivate our young generation to such service works. The Population Census Report (2011) of India shows that about 78 per cent of our country's population is less than 40 years of age. This is considered as our 'Demographic Dividend' and we can well imagine the potential energy in these millions of young Indians. They have the power to face any future challenge faced by our country. But how do we ensure the involvement of our younger generation in such selfless service works whose role models and icons today are mostly from the economic, technology, music, cinema and sports arenas? Here lies the true challenge of motivating these young people towards undertaking selfless social works for the benefit of common people. The key to the problem in my opinion lies in making our young generation understand that the real benefits of today's material advances lies not just in 'creating wealth' but ensuring that we should use it to make our society more egalitarian, more equitable and more socially and economically just. The more I think of this, the more I am

convinced that the answer lies in the clarion call that Swami Vivekananda gave the young of this country more than a hundred years ago. So, we must earnestly propagate the great ideas and ideology of Swami Vivekananda at different levels of our society to fulfil his dreams in near future.

Note:

1. **The *government of India initiated economic reform policies, giving special emphasis on decontrol and delicensing, and the expansion of the private sector, since 1991*.**
2. ***Purchasing Power Parity (PPP) dollar is an estimate of dollar, adjusted for the purchasing power of currency, to make international comparisons.***

References:

1. Banerjee, Abhijit V. & Duflo, Esther (2011), 'Poor Economics', Random House India, Noida, UP
2. CMIE (2020), 'Trend of Unemployment in India', Centre for Monitoring Indian Economy, Mumbai (retrieved from website: unemploymentinindia.cmie.com)
3. Dev, Mahendra. S (2012), 'Inclusive Growth in India- Agriculture, Poverty and Human Development', Oxford University Press.
4. Easterlin, R (2000), The Worldwide Standard of Living Since 1800',Journal of Economic Perspectives, Winter [referred in 'Growth & Development With Special reference to Developing Economies' by A.P.Thirlwall (8th Edn.), Palgrave Macmillan, 2006, p-29].
5. Economic Survey (2017-18), Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs.
6. Ghosh, Swarup Prasad (2006), 'Swami Vivekananda's Economic Thought in Modern International Perspective: India as a Case Study', Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata.
7. Kannan, K. P & Raveendran, G (2019),' From Jobless to Job-loss Growth Gainers and Losers during 2012–18', *Economic & Political Weekly*, November 9, Vol.- 54, No.- 44
8. Mazumdar, Debashis (2016), 'The Problems of Development Gap between Developed and Developing Nations: Is there Any Sign of Convergence'? Published in the *'Handbook of Research on Global Indicators of Economic and Political Convergence', (*ed) by Ramesh Chandra Das, IGI Global, USA, DOI: 10.4018/978-1-5225-0215-9.ch- 002, pp-29-50
9. NSSO (2017-18), "Key Indicators: Household Consumer Expenditure in India", Ministry of Statistics & Programme Implementation, GoI.
10. Ocampo, J.A & Vos, Rob (2008) (*ed*), 'Uneven Economic Development', Orient Longman.
11. Ranganathananda, Swami (2000), 'Practical Vedanta and The Science of Values', Advaita Ashrama, Kolkata.
12. Ritananda, Swami (2012), 'The Socio-Economic Thoughts of Swami Vivekananda- An Outline' (Bengali Version), published in Souvenir, Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home, Belgharia, Kolkata, p. 77-82.
13. Rakshit, Mihir (2007), 'Service-led Growth: The Indian Experience', Money & Finance, ICRA Bulletin, February, p. 91.
14. Sanyal, M.K;Sanyal, M & Amin, Shahina (2009) (*ed*), 'Post-Reform Development in Asia', Orient

Blackswan.

15. Swahananda, Swami (2012), 'Swami Vivekananda's Concept of Service', Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai.
16. Thirlwall, A.P. (2006), 'Growth & Development With Special reference to Developing Economies', Palgrave Macmillan.
17. Vivekananda, Swami (1998), Complete Works, Vol. I, II, V, Advaita Ashrama, Kolkata
18. Human Development Report (2011, 2018), UNDP.
19. World Development Report (2011), World Bank.
20. WEF (2020), *'Global Social Mobility Report 2020: Equality, Opportunity and a New Economic Imperative'*, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, January 19

Debashis Mazumdar
Professor & HOD, Dept. of Economics,
The Heritage College, Kolkata

Literary Adaptation in *"Salomé (1923)": Salomé, Medusa, Différance and Iterability*

Afsana Khatoon

Abstract

Charles Bryant's "Salomé (1923)" enchants the audience with its thrilling re-telling of "Matthew: 14" and stunning visual re-presentation of Salomé. Dressed in a beautiful piece with impeccable make-up, she appears like a nymph. But what strikes audience most is her hair: pearls studded on the edges of her gypsy, tiny-bristly-braids, she mirrors Ovid's Medusa: the once beautiful but now snake-headed gorgon whose sight turns onlookers into stones. Watching "Salomé (1923)", one notices, without failure, the sinuous movement of her tresses, as if, they are some living creatures. There are numerous traces of the Medusa-myth in the movie. Salomé's affinity with Medusa lies in her parents' incestual marriage as well. Bryant's film depicts the 'daughter of He-ródi-as' as a dejected and vengeful lover. But Salomé escapes such a structural narrative. She defies any reliable signified and constantly takes on different forms, through various genres as can be seen when in Bryant she resembles Medusa. A deconstructive reading highlights the similarities between "Salomé (1923)" and Medusa-myth and shows that these two narratives are signatures, the authenticity of which depends on the law of iterability and différance.

Keywords: *literature, cinema, deconstruction, Salomé*

Of all the biblical characters Salomé is the one who has fascinated academics, artists and intellectuals through centuries. Hardly there is any other female character from the New Testament who dominated drawing room reading, theatre, visual arts, burlesque, music hall and opera all alike. Toni Bentley in the essay "The Salome Craze" terms this obsession for Salomé "Salomania" (Bentley). Rachel Shteir writes about it in the essay, "Undressing": 'In the first decade of the twentieth century . . . a craze touch(ed) virtually every aspect of American popular and "high" culture . . .'(Shteir). Amongst those who contributed to the "Salomania" predominantly and excessively were Gustave Moreau[1], Gustave Flaubert[2], Karl Joris Huysmans[3] and Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde. Seen from a Feminist point of view Wilde in his Salomé (1891) appears to have liberated female sexuality, by making his protagonist claim her selfhood at a time when women just began to raise their voice against gender inequality. In fact, in Sister of Salome Bentley celebrates the 'declarations of sexual independence' (Bentley) that Salomé (1891) led to. However, in her feminist critique of patriarchy Bentley overlooks how the so-called 'liberation' in terms of sexuality also tries to bind 'Salomé', along with all her sisters, to something on which phallogocentrism rests – the binary of body-

Khatoon Afsana : Literary Adaptation in *"Salomé (1923)": Salomé, Medusa, Différance and Iterability*
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 80-87, ISSN 2249-4332

and-mind or instinct-and-intellect. In my paper I intend to show that it is not the 'dance of seven veils' or the act of stripping off that frees Salomé but the 'movement'–her movement from the 'daughter of He-ródi-as' to a woman who can acknowledge her selfhood that liberates her and makes her re-presentable, different and iterable. For my presentation on 'Salomé' I have chosen the 1923 silent movie made by British filmmaker, Charles Bryant, to show how the 'daughter of He-ródi-as' (The Holy Bible) – as she has been introduced in New Testament) acts as an fluid signifier and keeps on evolving through ages and genres, taking various forms and alluding the structures that try to confine her within the nomenclature, 'Salomé'.

Charles Bryant's "Salomé (1923)" is a movie adaptation of Oscar Wilde's 1891 French tragedy, Salomé. Wilde represents Salomé as a woman driven by lust for a preacher and prophet, Jokanaan. Salomé, struggling between her filial affection towards her mother and the unwanted-unwelcome attention of her stepfather, discovers her desire when she hears Jokanaan pray. When she first sees him, she is fascinated by the mystical priest. She approaches him to confess her thoughts. However, the priest insults her and warns her for her impious longings. But she does not understand. Her impromptu attraction takes on the color of carnal desire and soon her libido becomes her obsession. She has been talked into sanity, warned and threatened with life but she refuses to abide by any socio-theological culture or religious practice. It is her obsession with the prophet that eventually costs Salomé her life. Under Bryant's direction Wilde's drama becomes a tragedy that celebrates the unrequited love of a woman who eventually meets a catastrophic end for coveting "a holy man"(Wilde). But things become problematic when her desire is taken as constitutive of her identity:

Oscar Wilde gave Salome what she had heretofore lacked: a personality, a psychology all her own. Wilde transformed Salome from an object of male desire and fear into the subject of her own life (Bentley).

Do the above quoted lines suggest that the action of experiencing love or carnal desire for a male and the act of expressing that desire is what constitutes 'a real woman?' as Bentley seems to argue? Unfortunately, here Bentley seems to support an idea that she has originally intended to oppose: the idea that women represent sexuality while men represent judgement as shown in the first book of Old Testament, "Genesis"(The Holy Bible). Wilde's one-act tragedy indeed appears to be romantic but putting the play into a specific genre, by bestowing upon Salomé the attributes of Shakespearean Juliet, does not simplify the complications of the narrative. First, Bryant designates his movie as a 'historical fantasy'(Bryant). Something that is historical was real once – a reality of past. How can history then be fantasy or fiction or a product of imagination without the substantiality of the temporal and/or the spatial context? Bryant himself contradicts the credibility of the genre and the context in his subtitle. Secondly, imitating Wilde, Bryant presents his movie – "Salomé (1923)" – to the audience as a biblical narrative but the irony lies in the very name of the titular character, after whom he has named the movie because Salomé is never named in the New Testament but referenced only in association with her mother, Herodias – 'daughter of He-ródi-as' (The Holy Bible). Biblical

narrative on Salomé or rather the 'daughter of He-ródi-as', depicted in Gospels of Matthew, Verse: 14, is a brief upon her role in the murder of John the Baptist which can be interpreted as a sketch, silhouette or an outline – because these words are often used interchangeably for any literary portrait or depiction (Derrida, The Animal Therefore I Am). The French novelist and poet Pierre Alféri[4] points out the limits of such an 'outline',

> (T)he outline is visible but the outline although visible, does not literally exist because it's only the limit between the object and what is not the object, and its changing on all the different points of view on the object, it's a limit, it's not a thing . . . it exists only from one point of view, between the visible part of a volume and the invisible part of the volume . . . between what I see and what I don't see, it's an ideality ("Pierre Alféri. Life Lines. 2016").

What "Matthew: 14" represents is neither the 'daughter of He-ródi-as' nor Salomé but only the 'limits' of the damsel. Alféri has been careful to add, farther: "an outline is essentially approximative" that can be corrected and repeated almost indefinitely. The biblical narrative of the damsel is only an 'approximation' of a woman who is the 'daughter of He-ródi-as'. But that merely represents something between 'what I see and what I don't see' ("Pierre Alferi. Movement in Cinema. 2010") of Salomé rather than her character. The daughter who obeys her queen mother, performs a dance for her stepfather's princely guests and demands the head of Jokanaan who tried to defile her mother, is the woman lost between the 'visible part of a volume' (what is described about her) and 'the invisible part of the volume' (what is not described or omitted or erased about her) of a biblical portrait. It is incomplete, ambiguous, approximate and inexact, hence, subject to correction and repetition or iterability. Both Wilde and Bryant exploit this 'approximate-ness' or 'inexact-ness' of the biblical narrative that makes Salomé iterable and enables writers to (re)present Salomé, again and again, repeatedly and indefinitely.

The name 'Salomé' is a written sign proffered in the absence of the referent of the 'daughter of He-ródi-as'. The act of naming plays a significant role in the history of metaphysics for to name is to designate a signified – to provide a history along with all its cultural, social and political conventions. Jewish historian Titus Flavius Josephus gives an etymology of the name 'Salomé' (Salome). Josephus identifies Salome with the wife of Aristobulus, who reigned Chalcis of Galilee, 54-72 A.D. Josephus writes in Antiquities of the Jews (c. 94) that 'Salome' is a 'variant' of 'Salina' or 'Alexandria' (as she was known amongst the Greeks). The name varies in accord with continents: Salome, Salina and Alexandria or Alexandra. But can one be really sure that all these three names refer to a single and identical woman? One can only assume so or rely on the possibility that Josephus' record about the Jewish people, the context and the chronology might be plausible. But such assumption or reliance is subject to methodological errors because a deconstructive interpretation of Semiotics teaches one that any name is a linguistic sign that represents the absence of a subject as Derrida points out in "Différance":

> The sign is usually said to be put in the place of the thing itself, the present thing, "thing" here standing equally for meaning or referent. The sign represents the place of the present. When we cannot grasp or show the thing, state the present, the being-present, when the present cannot be presented, we signify, we go through the detour of the sign (Derrida, Margins of Philosophy).

Wilde represents the 'daughter of He-ródi-as' in his protagonist, named Salomé (in French) or Salome (in English); he puts Salomé in the place of the thing ('daughter of He-ródi-as'). The reader is expected to recognize the 'daughter of He-ródi-as' in the protagonist, as suggested by the epithet 'SALOMÉ (Daughter of Herodias)'(Wilde). But the addressee for 'the daughter of He-ródi-as' is not present in Wilde's Salomé (1891). Hardly does she exhibit any thought regarding the whereabouts of Herodias, the woman who lends Salomé her identity and existence in the New Testament. In fact, throughout the drama she does not have a single word of exchange with Herodias. Herodias and Salomé rather seem to live in their two different worlds, separated and set apart from each other. The absence of signified continues because neither the mystical daughter of Herodiasis present in Wilde's adamant Salomé nor Salomé could be found in the Daughter of Herodias. The absence is iterable in both. Bryant projects Salomé as a lover of Jokanaan,thereby introducing 'the detour' and taking a long or roundabout route to avoid this iterable/repetitive absence of signified or referent of the biblical 'daughter of He-ródi-as' – as if to say that the 'daughter of He-ródi-as' is not present in Salomé because she has become a lover now. Salomé even refuses what Bryant so earnestly wants her to portray. She only postpones the referents by being different from the signified, 'the daughter of He-ródi-as' in the New Testament (The Holy Bible)or that of Jokanaan's lover in Wilde's drama, through différance. Derrida writes: "(T)he signified concept is never present in and of itself, in a sufficient presence that would refer only to itself. Essentially and lawfully, every concept is inscribed in a chain or in a system within which it refers to the other . . .(Derrida, Margins of Philosophy). Salomé is caught within such a chain of signs where the damsel refers to themystical 'daughter of He-ródi-as', the biblical 'daughter of He-ródi-as' refers to Wilde's new woman Salomé and Bryant's Salomé refers to the woman who adopts extreme measures for Jokanaan. In each instant Salomé is meant to gain her selfhood but that remains merely a probability as each re-presentation adds on a difference to the sign, the 'daughter of He-ródi-as'. This process of including a difference is what Derrida terms 'différance'. Différance means to put off (an action or event) to a later time or postpone and to be unlike or dissimilar or different. The difference, between the 'daughter of He-ródi-as' and Salomé exists in terms of affection, care and sacrifice, which the former exhibits in "Matthew: 14" while the latter eludes thesein Bryant. This difference is the play of the two signs – "daughter of He-ródi-as' (signifier) and 'Salomé' (signified). These signs are themselves the effects of différance and the iterability of the absence of an addressee. This absence of addressee makes Salomé vague and in this vagueness Salomé is seen adopting various forms as she does in "Matthew:14", or in Jules Massenet's 1881 opera Hérodiade[5], or in Robert E. Howard's

1934 novella A Witch Shall Be Born[6] or in Carol Ann Duffy's poem "Salome[7]" collected in The World's Wife (1999).

Speaking on 'cinema' Pierre Alféri says that the essence of cinema is 'motion' ("Pierre Alferi. Movement in Cinema. 2010"). What the cinema gives to a text or narrative movie is 'motion' which cannot otherwise be conveyed through words. Salomé acquires motion in Wilde's drama twice over for she takes on the role of the biblical 'daughter of He-ródi-as', and performs the indicated actions. First, her writer endows her with the skills of dance; secondly, he transforms her from 'SALOMÉ (Daughter of Herodias)' of the introductory passage to 'THE VOICE OF SALOMÉ' of the closing lines – from a woman of flesh and blood (shown through pictorial representation, upon the stage) to the invisible, transient 'voice' (perceived through auditory representation) heard from beyond the stage. When Bryant adapts Wilde's drama he too introduces 'motion' or movement to the narrative of 'Salomé' – the motion visible in her act, her face and even her tresses. Wilde could not depict the physical motion that he invents and bestows upon his femme fatale; the task is left to Bryant who has invested 'Salomé' with a movement, literally by proving a visual representation of 'the dance of seven veils' and metaphorically by depicting her journey from an aimless puppet to a woman with a search. It is because of this motion that Salomé keeps on adopting new characters and absorbing fresh personalities, through decades and through various genres. She indeed takes another form when Bentley visualizes Medusa in Aubrey Beardsley's sketch of Salomé (picture shown below, Figure 1)(The Climax) :

Figure 1: The Climax, 1893 illustration by Aubrey Beardsley

"Salome and John, both sporting Medusa-like tendrils and horns" (28) of Arthur O'Shaughnessy[8] describes Salomé's hair as snake, collected in "Salome", The Daughter of Herodias (1870) :

Her long black hair danced round her like a snake
Allured to each charmed movement she did make;
Her voice came strangely sweet . . .
And what her voice did sing her dancing feet
Seemed ever to repeat . . . (Percy).

In Bryant's movie Salomé reflects yet another character, Medusa. Bryant's movie, "Salomé (1923)" shows Salomé in various beautiful costumes but amongst all of her stylish getups the one in which she spends almost one-third of the movie is a short black dress and tiny bristly braids with pearls studded on the edges on each tresses (pictures given below, Figure 2) (Alla Nazimova's Iconic 1923 'Salome' Wig Discovered in a Trunk in Georgia.)

Figure 2 : Alla Nazimova in "Salomé (1923)" (left), the wig (right)

Every time Salomé (played by Alla Nazimova) presents herself as an independent character she shows strong emotions and sometimes nods her head. It seems as if her vivacity is transferred to her eyes and unto her hair for her eyes look brighter, enchanting, and celestial and her tresses move as if they are some living creatures. The image may remind one of Medusa, the gorgon with living snakes for hair. Salomé in fact shares a number of traits with the Greek mythological gorgon. Hesiod in Theogony informs his readers that Medusa is one of the three daughters of Ceto, daughter of Sea and Earth, and Ceto bore Medusa to her own brother Phorcys (Hesiod). Therefore, Medusa was born of incest. Salomé too is a child of incestual marriage as her father Herod II was the half-uncle of her mother, Herodias (Kokkinos). Ovid outlines the story of Medusa in Metamorphoses. She was a beautiful mortal once but Neptune rapes her in the shrine of Minerva. For the violation of her temple, Minerva punishes the maid by turning her gorgeous hair into snakes and cursing her gaze. After the incident, whoever looks at Medusa's face is metamorphosed intostone. In Bryant's movie Salomé too turns Herod Antipas, the Tetrarch of Judaea, into stone, although metaphorically. Right from the beginning of the movie Herod is seen eyeing Salomé as he has been enamored of her charm.

Herodias is seen taunting the Tetrarch, repeatedly: "You must not look at her ! You are always looking at her(Wilde) !" Two soldiers in guard observe the same :

FIRST SOLDIER. The Tetrarch has a sombre aspect.
SECOND SOLDIER. Yes; he has a sombre aspect.
FIRST SOLDIER. He is looking at something.
SECOND SOLDIER. He is looking at some one.
FIRST SOLDIER. At whom is he looking? (Wilde)

Even Salomé herself notices this and wonders, "Why does the Tetrarch look at me all the while with his mole's eyes under his shaking eyelids? It is strange that the husband of my mother looks at me like that. I know not what it means. Of a truth I know it too well (Wilde)." The same Tetrarch abhors her, calls her 'monstrous' and grants her death in the end as if her sight has turned him into stone (for stone as a metaphor stands for coldness, indifference and cruelty). Like Medusa-gorgon Salomé too undergoes some kind of metamorphosis–a metamorphosis that is caused by lust and violence. The only difference is that in Ovid's verse-narrative Medusa is the victim of lust whereas in Bryant's "Salomé (1923)" it is Jokanaan who becomes the victim when he is beheaded. Thus, Salomé resembles Medusa but from a distance or with some differences. One can even find her affinity with the slayer of Medusa, Perseus. Perseus kills Medusa to save Andromeda and Salomé demands the head of Jokanaan, for the sake of her mother as suggested from Herodias's musings in Wilde's drama, "My daughter has done well to ask the head of Jokanaan. He has covered me with insults. He has said unspeakable things against me. One can see that she loves her mother well .... (Wilde) ." Salomé continuously evolves and takes various forms as a doting daughter, a courageous woman, and an independent adult who makes her own choices against the tyranny of her royal parents who use her as nothing but an object. What the reader/ audience sees in Salomé is how s/he interprets her: the 'daughter of He-ródi-as', a woman looking for a lover, Medusa-like-monster or even a savior similar to Perseus. An attentive reader may find traces of all these characters in Salomé at the same time when she refuses to conform to any of them, solely or undividedly.

Works Cited

"Pierre Alféri. Life Lines. 2016". YouTube, uploaded by European Graduate School Video Lectures, 17 Mar, 2017, n.d. https://www.youtube.com/watch?v=5ylFrDCyoYU.

"Pierre Alferi. Movement in Cinema. 2010". YouTube, uploaded by European Graduate School Video Lectures. 05 June, 2011, n.d. Accessed 09 Sept, 2020. <https://youtu.be/OGLF4OQ2Ojo>.

"Alla Nazimova's Iconic 1923 'Salome' Wig Discovered in a Trunk in Georgia." 04 10 2015. Wikipedia. uploaded by Alla Nazimova Society. https://martinturnbull.wordpress.com/2015/03/14/announcing-an-exciting-discovery-of-costumes-and-trunks-once-owned-by-alla-nazimova/.

Bentley, Toni. Sisters of Salome. London: Yale University Press, 2002. E-book.

Derrida, Jacques. Margins of Philosophy. United States of America: The University of Chicago, 1982. E-book.

—. The Animal Therefore I Am. New York: Fordham University Press, 2008. E-book. 09 August 2020.

Hesiod, translator M. L. WEST. Theogony and Works and Days. New York: Oxford University Press, 1988. E-book.

Josephus, Flavius. Jewish Antiquities, Books XII-XIV. Great Britain: Harward University Press, 1957. E-book.

Kokkinos, Nikos. The Herodian Dynasty: Origins, Role in Society and Eclipse. London, UK: Spink & Son Ltd., 2010. E-book.

Ovid, translator, David Raeburn. Metamorphoses. England: Penguin Books, 2004. Paperback.

Percy, William Alexander. editor. Poems of Arthur O'Shaughnessy. Worcestershire: Read Books Limited, 2013. E-book.

Salomé (1923 Film). Wikipedia, n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_(1923_film). Accessed 15 July 2020.

Salomé (1923). Dir. Charles Bryant. Perf. Alla Nazimova. 1923.

Salome. Wikipedia. 7 September 2020. Wikipedia, The Free Encyclopedia. 20 09 2020. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Salome&oldid=977107295>.

Shteir, Rachel. Striptease : The Untold History of the Girlie Show . New York, USA: Oxford University Press, 2004. Print.

"The Climax." 04 Sept 2015. Aubrey Beardsley illustrations for Oscar Wilde's play, 'Salome'. Wikipedia, uploaded by Alla Nazimova Society. http://www.allanazimova.com/2015/03/alla_nazimovas_iconic_1923_salome_wig_discovered_in_ga/. Accessed 11 July 2020.

The Holy Bible. England : National Publishing Company, 1978. Paperback.

Wilde, Oscar. Salomé. The Importance of Being Earnest and Other Plays. USA: A Signet Classic, 1985. E-book.

1 Moreau's 1876 paintings "Salome Dancing before Herod" and "The Apparition".
2 Flaubert wrote 1877 short story "Herodias".
3 Huysmans' 1884 novel Against the Grain.
4 Alféri is the son of the philosopher Jacques Derrida and psychoanalyst Marguerite Aucouturier. He is also a renowned filmmaker.
5 In Massenet Salomé wants to die with the prophet in vain and stabs herself in despair.
6 In Howard's Salome becomes a sorceress, a reincarnation of biblical Salomé.
7 Where Salome appears like a modern day Belinda who basks in the glory of her beauty
8 A nineteenth century, pre-Raphaelite poet.

Afsana Khatoon has completed M.Phil. from the Department of Folklore, University of Kalyani, Nadia. Presenrtly, she is an independent researcher.

The Notion of Uncanny in Marleen Gorris' Mrs Dalloway : A Freudian Reading

Subhashish Sadhukhan

Abstract :
During and after the First World War (1914-1918) shell shock is a recurrent occurrence. The term shell shock was coined in 1917 by a Medical Officer named Charles Myers in *Lancet(1915)* to describe the "psychological effects of warfare which traumatized soldiers" who "experience severe anxiety, flashbacks, nightmares, insomnia and anger, amongst other symptoms". It was also known as war neurosis, combat stress and PTSD (Post Traumatic Stress Disorder. The paper focuses on the neurosis of Septimus Warren Smithwho is suffering from delayed shell shock as depicted in Marleen Gorris' 1997 adaptation of Virginia Woolf *MrsDalloway*(1925). By looking at his trauma, this paper aims at exploring the phenomenon of Uncanny. This paper through a psychoanalytical reading of Septimus with Sigmund Freud's theory of Uncanny which he has elaborated in *The Uncanny* (1919) tries to establish how Septimus' PTSD is associated with the Uncanny caused by the return of repressedmemories. For analyzing Septimus' complex anxiety prone psyche which forces him to experience uncanny and eventually to commit suicide, this paper traces the similarities between Septimus and Nathaniel from *The Sand Man* (1817) by E.T.A. Hoffman.
Keywords: First World War, Shell Shock, PTSD, Uncanny, Repressed Memories

Sigmund Freud in his 1919 essay *The Uncanny*discusses the nature of uncanny and how it is different from mere fear. To define uncanny, he uses the German terms *Heimlich* which means familiar, native, belonging to home; and Un-Heimlich which means un-homely, strange, unfamiliar. But these two terms are not opposite in meaning but interconnected. He goes further by saying that all frightening and unfamiliar things should not be categorized as Uncanny. Although Jentsch asserts that the feeling of Uncanny can only be aroused by intellectual uncertainty in which one does not know where one is,Freud theorized the concept of Uncanny in a slightly different manner. As per Freud, following are the conditions in which one can experience Uncanny:Uncanny is something or somebody familiarly unfamiliar that comes with a threat. It is something which provokes anxiety, fear and supposed to remain hidden but comes into the light. It is the encounter with things, situations, persons, events, and impressions which are ambivalent, frightening and familiarly unfamiliar that creates the feeling of Uncanny(219-226). This Uncanny experience can be felt by the characters within a fictional space or by the readers of the fiction or by real-life human subjects.Some of the ways in which fiction or life makes us experience the 'Uncanny' include making us encounter the

Sadhukhan, Subhashish : The Notion of Uncanny in Marleen Gorris' Mrs Dalloway : A Freudian Reading Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 88-93, ISSN 2249-4332

"double", blending of reality and fancy and reviving animistic belief. Uncanny is experienced due to the return of the repressed and traumatic psychical materials from the past, predominantly from one's childhood. Uncanny evokes the past which is associated with childhood (234-235).Although there might not be direct objective cause to arouse the feeling of Uncanny, Uncanny revives the 'fear of castration' and triggers 'repetition compulsion' for the subject both in real life and in fiction(231-233).

In the film *Mrs Dalloway*, Septimus Warren Smith is shown to possess some behavioural traits which might incite us to focus on his characterthrough the lens of Freudian theory of Uncanny. The impact of war should also be taken into consideration whileinterpreting Septimus' fear.With the beginning of the First World War (1914-18), the word *war* has become a threat to European civilians and the impact of it was mostly on the premature minds of young soldiers. Some were fascinated by the notion of patriotism associated with war, whereas for most of them, the war was nothing but a nightmarish experience of murdering, suffering, fighting, firing, bombing, crying, starving, and dying.Warmongers demand the life of the young soldiers just as Sand Man craves for the eyes of the children. The only difference seems to be the Sand Man plucks eyes for feeding his children in the moon, whereas warmongers take the lives of soldiers to feed the nation. Like Sand Man, warmongers become the constructed father figure to scare the young boys of the Europe. But this concept of Sand Man will be more explicit when we shall relate Sand Man with Dr. Holmes in Gorris' *Mrs Dalloway*.

The soldiers had no options left to avoid war as it had become the question of their masculinity. The soldiers wanted to express their love for motherland by showing their valour in the battlefield but when they confronted the reality of the war, they came to know the war is sheer futile bloodshed and violence in which they did not find any inherent connection with their masculinity. They also become aware of their role dictated by the warmongers which will never allow them to become a real hero or the real lover of their motherland, and they start feeling guilty for their inhuman act of killing. But the resistance to be driven by the father figure comes with a threat.

A male child starts suppressing his desire to take possession of his mother's body at the very moment he realizes there is the father who is going to castrate him if he thinks more of it and gradually accepts the role dictated by his father. Here the case is much more complex.On the one hand, the soldiers have not enough courage to confront the father figures (warmongers), on the other hand, they can't play the role of the ideal hero dictated by their fathers. They, thus, start feeling the dilemma which creates in them anxiety, panic, disturbance, and most of all is the *castration complex*which is caused by not being able to accept the norms of society dictated by the politicians, leaders, warmongers. There is no denying of the fact that every aspect of castration is also the experience of trauma.

Septimus Warren Smith in Gorris'*Mrs Dalloway* is portrayed as war patient whose health is terribly deteriorated after he started talking to the dead which is caused by the return of the repressed memories of trauma after few years later of his First World War experience. The

audience first came to know about the peculiarity of Septimus' character once they come across him in the film. The first dialogue of the film is spoken by Septimus,"Evans! Don't come!" Septimus is shown in a trench of Italy where he is a veteran soldier who experienced the death of Evans. Although we have no clue who this Evans was but with the progression of the plot, we come to know from Rezia, Septimus' wife, that Evans was Septimus' friend when Dr. Bradshawis informed by her, "Septimus keeps talking the dead man, Evans, his friend was killed in war."

Although in the beginning when Septimus is shown outside the flower shop, where Mrs. Dalloway went to buy flower for her party, our curiosity about his character has been just aroused by his appearance of being afraid when he looks at the flower and Mrs. Dalloway. But we might have forgotten him if we had not come across him repeatedly in the film. The next appearance of Septimus with his wife Rezia in a garden cannot be ignored and has a pivotal role to play in understanding the Uncanny.

In the Garden scene, while both Septimus and Rezia have been sitting down there was a terrible noise coming from airplane. The sound of airplane evokes in him the traumatic experience of war and he gets horrified and shameful for his deed in the battleground. Here the sound of airplane has become the catalyst which helps him to remember his past and he gets disturbed and eventually that leads him to start talking things which seem nonsense to Rezia. This very garden scene reminds of Woolf's another famous short story *Kew Gardens*(1919) where Woolf presents four sets of people who visit Kew Gardens. By looking at Gorris's*MrsDalloway* along with Virginia Woolf's*Kew Gardens*, one can see how the shell-shocked patients reacted almost in same way towards the natural objects, although few exceptions are there.They find a severed relationship with nature. They try to go close to natural objects as if they try to establish a bond again. They find no distinction between animate and inanimate objects like flowers and, thus, talk to the flowers which create a feeling of *uncanny* as Freud's argues in *The Uncanny* that it is the blending of reality and fancy and reviving animistic belief that create the feeling of *uncanny*. It is very interesting to note here the use of flowers. Both in *Mrs Dalloway* and in *Kew Gardens* the mention of flowers makes the point of animistic belief so strong that it also reminds us of the poem *Death shall have no Dominion* by Dylan Thomas where the sole focus is on the eternity of the soul. After death, the soul will go out of the body and start roaming through every object of nature and it will also be in the heart of flowers which will raise their head with the rise of sun till the sunset. This is an example where we see that the belief that in every object there is a presence of soul is very strong. Here also, Septimus, like the elder man of *Kew Gardens*, talks to the fern as if he is talking to the persons who are dead. Rezia informs Dr. Bradshaw, "He says people are talking behind bedroom walls and he saw a woman's head in the middle of the fern". This inability to identify and differentiate the living and the dead causes one to experience a feeling of uncanny.

Septimus thinks that nature has condemned his soul and therefore he "cannot feel". It was these natural objects which once made their soul peaceful but now they remind the shell

shock patients of their past horrible memories and their guilt. It is evident in Septimus' words:

> "I did not care, when Evans was killed. That was the worse, but all the other crimes raised their heads, shaked their fingers and they cheer, and they sneer. And the verdict of human nature on such a beast is death!"

This sense of guilty breaks the moral of the soldiers and weakens them from the core and it becomes very difficult for them to get rid of their past. It is the noise of airplane and Peter Walsh in the garden scene (double of Evans) that help arousing repressed memory of past war experience of Septimus. They come back with a threat to him because Septimus tries to hide his experience of War as it was full of crime and cruel deeds.

Dr. Holmes plays a vital role, which is responsible for arousing the castration fear in Septimus leading him to jump of the window at the approach of the doctor. It is not very clear whether Septimus knew Dr. Holmes in his childhood or not. But there is no denying of the fact that Septimus feels a sort of castration fear because of this character which is evident in the words and action of Septimus in Gorris'1997 adaptation.

In *Mrs Dalloway*, we see two Doctors- Dr. Bradshaw and Dr. Holmes. Although Dr. Bradshaw is seen to have a harmless appointment with Septimus, both of Dr. Bradshaw and Dr. Holmes represent the authority which makes Septimus feel paralysed by unfolding the hidden repressed memory of Evans' death by explosion which comes to his mind just as the memory of his father's death by explosion in the hand of Coppola comes to Nathaniel's mind. It is shocking both for Septimus and the audience when in the garden, Septimus saw his friend Evans coming towards him and Septimus, being totally baffled, says, "For God's sake, don't come!" This is perhaps because of the traumatic moment of explosion associated with his past memory which comes back because of his encounter of the 'double'; reflection of Evans in Peter Walsh.

When Dr. Bradshaw asked Rezia, "He has impulses, sometimes?", Septimus says, "That is my own affair!" which indicates Septimus' intention of keeping things secret. The conversation among Dr. Bradshaw, Septimus and Rezia can bring more light into our discussion:

> Dr. Bradshaw: Do sit down. I see that you served with great distinction in the war, Mr. Warren Smith.
>
> Smith: At the war?The European war. A little shindy of Schoolboys with gunpowder. Did I serve with distinction? I'd forgotten. In the War, itself, I failed.
>
> Rezia:No, he served with the greatest distinction. He was promoted.
>
> Septimus: I… I have committed a crime.
>
> Rezia: He's done nothing wrong whatever.
>
> Dr. Bradshaw: What did Dr. Holmes advised you to do?
>
> Septimus: Well, my wife, he said,should make me porridge. Headaches, dreams, fears are just nerves. Health is largely a matter of our own control. I should take up some hobby.

Till this point we find there is nothing fearful about Dr. Holmes but the next words of Septimus

give us a new perspective to look at Dr. holmes. Septimus says, “when the damn fool came again, I refused to see him”. The figure of Dr. Holmes is much like both Lewis Yealland, a British Clinician, and the Sand Man.Although there is not any evidence to prove Dr. Holmes is the Sand Man.But a little bit of analysis of Septimus’ speech and attitude might direct us towards a better verdict. During the meeting with Dr. Bradshaw, Septimus describes Dr. Holmes in a negative term. Dr. Holmes is described by Septimus as an “impulsive brute” having “blood red nostrils”.

Septimus tries to escape his treatment and gets afraid with the mentioning of Dr. Holmes’ name. Still, we are in doubt and in a dilemma. Should we characterize Dr. Holmes as the terrible Sand Man for all these? Perhaps the answer would be, “No”. But if we go little further and observe the impact of Dr. Holmes on Septimus, then we might find some connection to establish Dr. Holmes as a nightmarish figure and the impact that he left on Septimus is quite similarto that of Coppola, representing Sand Man, on Nathaniel. In the case of Nathaniel there is no Sand man at all but the association of Sandman with Coppelius and later with Coppola creates a sense of fear in Nathaniel. If we take the word *fear*to understand this point, then we can well understand how Dr. Holmes creates fear in Septimus. But this is not merely fear of Dr. Holmes but also this is the fear that reminds him of the brutality of treatment which Septimus might have been aware of.

Lewis Yealland, a British clinician, in *Hysterical Disorders of Warfare*(1918), states how he treated his shell shock patients using torturous methods which include “electric shocks to neck, cigarettes put on patient’s tongue and hot plates placed at the back of his throat”(MacDonald). Moreover, he threatened his patients by telling, ”You will not leave this room until you are talking as well as you ever did; no, not before… you must behave as the hero I expect you to be” (MacDonald). Yealland was sometimes more threatening to the soldiers than that of the war itself. Here in Mrs. Dalloway, Dr. Holmes may be the representation of the Doctors like Lewis Yealland. His treatment might take Septimus’ life away. In front of Dr. Holmes, Septimus is no longer the courageous soul who fought in the battle but a man always in fear of being castrated by authority.

Dr. Holmes in ostensible reality is the person who tries to help Septimus just as Coppelius does to Nathaniel’s father and later helps him by selling him spyglass. But with the appearance of Coppola the repressed memory of the death of Nathaniel’s father is brought back which creates a fear psychosis in him. Later, when Coppola plucks the eyes of Olympia, Nathaniel cannot control his own self and went into a psychicalfrenzied zone. In the end, when he is on the tower with Clara, he brings out the spyglass to see Clara and he is again reminded of Olympia. He then goes mad and when he again sees Coppola amid crowd, he jumps from the tower to kill himself. Here the fear is of losing eyes and, thus, of losing the most sensitive part of our body. It is relevant to see the loss of eyes as losing male genital that more often than not interpreted as the most precious object of desire.

Here in Septimus’ case Dr. Holmes is someone whose attempt is seen to make a

separationbetween Septimus and his most precious object of love which is Rezia herself whom he loves the most. But when he realizes that he must rest because Dr. Holmes has told him to, he feels a sense of being castrated because of the word "must" that restricts his free will and controls his voluntary actions; rather he is now completely swayed under the power of Dr. Holmes. He cannot tolerate it and feels a threat of being castrated and experiences the uncanny because of the *familiarly unfamiliar* association of Dr. Holmes with all the authority figures who had been a threat to his idea of masculinity.

The fear of sand man is again associated with sleep. Refusal to go to bed arouses the memory of the childhood-tale of the Sand man who will throw sand into the eyes and bleed out the eyes from the sockets. If we look at closely, we shall see how Septimus is trying to sleep by telling himself "Fear no more" at the time of Dr. Holmes' coming, suggesting the implicit connection between the fear of authority and the also that of castration. It might also be the fear of being treated badly by Dr. Holmes by using his methods. The gesture of Septimus is like an infant which compels us torethink whether the fear of Septimusis only aroused by Dr. Holmes or Septimus is reminded of something more.

Throughout this essay, I have been trying to trace the situations which are relevant to point out how the elements of Uncanny work in Marleen Gorris' portrayal of WWI veteran soldier Septimus Warren Smith in *Mrs Dalloway*by analyzing the conditions of shell shock patients of the First World War.

Works Cited

Freud, Sigmund. "The Uncanny." *Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. 17 (1917-1919): An Infantile Neurosis and Other Works*, Hogarth P., 1955, pp. 217–252.

Gorris, Marleen, director. *Mrs. Dalloway*. First Look International, 1997.

Mcdonald, Marycatherine, et al. "From Shell-Shock to PTSD, a Century of Invisible War Trauma." *South Carolina Public Radio*, 24 May 2017, www.southcarolinapublicradio .org/history/2017-04-06/from-shell-shock-to-ptsd-a-century-of-invisible-war-trauma.

Woolf, Virginia, "Kew Gardens", *A Haunted House and Other Short Stories*. Edited by Leonard Woolf, The Hogarth Press, 1944.

Subhashish Sadhukhan (NET-JRF) is an Independent Researcher
Formerly a Post-graduate student of Presidency University.

Literature as an Effective Tool for English Language Teaching/ Learning

Shubhaiyu Chakraborty

Abstract

Ever since English has gained prominence as a mode of communication in the international arena, the craze for learning the language soared higher and higher. The developing nations like India and other South-East Asian countries felt it necessary to equip themselves with the pros and cons of language learning. Even though India has a legacy of learning English as a foreign language owing to years of foreign domination yet the teaching/learning scenario of the natives lacked first paced improvement owing to infrastructural as well as faulty methodology adopted by both teachers and learners. Literature is Language well used and charged with meaning to the utmost degree. It is mirror of the society, expressions of joy, of happiness, of life-of all basic human emotions. Hence, Language Teaching/Learning is incomplete if it is not taught through literature as it is more close to one's heart than rote learning of mere grammatical rules, syntax and vocabulary. The teaching/learning of stress, rhythm and intonation- the basics if one intends to learn a stress-timed language as English- find best expression in literary pieces. This paper attempts to unfurl how literature can be used as an effective tool for language teaching and learning.

Key words : ELT, literature, competence, language learning

English is a funny language which explains why we park our car on the driveway and drive our car on the parkway. It sounds strange but true as per information of the 25th Edition of the *Ethnologue* (2022) that this funny language has over 1.5 billion speakers today. It even crossed Chinese which comprise of over 1.2 billion speaker approximately. In fact millions of people speak in different dialects of English today; some use one version of this language as their mother tongue, and others use English as a foreign language. More than a hundred countries use English as a second language or an official language for business and international communication. At base, the present status of English can inevitably be compared to that of the standing of Latin till the decline of Roman Empire. For many other countries English is widely taught as a second language the world over even if it is not the official language for them. Thus we cannot deny that English can be proclaimed to be a global language today. At times it even serves as a medium of communication between speakers having different mother tongues. Continuous research is thereby conducted on the different ways to make effective communication in English.

"Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man" (Bacon

Chakraborty, Shubhaiyu : Literature as an Effective Tool for English Language Teaching/Learning
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 94-100, ISSN 2249-4332

113). But the task is bit difficult if one intends to teach English language in India. Despite having a heritage of almost three hundred years, the teaching of English in India has not still attained the efficiency as desired for such a language. The Charter Act of 1813 was the first step towards the teaching of English in the colonial phase though the hidden agenda for the imposition of English was its avowed intrinsic merit, its ability to fasten a colonially useful system. In Macaulay's view, it would foster a class of persons Indians in blood and colour, but English in taste, in opinion and in morals and intellect. So the first colonial purpose was to prepare intermediaries, the second was missionary. The purpose was to bring Christianity into the land and seek proselytes to shatter the huge fabric of popular Hinduism. Even the commissions constituted in post-independent India could not force interest in the learners and even if they *forced* interest certain basic problems did act as a road block in the effective teaching/learning process.

Effective communication in English is only possible if the learner can master the four major skills of communication namely **Listening, Reading, Writing and Speaking**. The primary task of the teacher is to teach the students the art of **listening** and this is the most difficult part as one tend to speak more and listen less apart from communication selectivity. Naturally a lot of ready techniques are available in the market like use of gadgets such as mobile phones and tablets thereby storing as many English songs , English movies and radio talks in them and trying to listen to them as much as possible. ELT training is incomplete without listening to BBC became cliché now as the focus shifted to using English for specific purposes rather than using the correct British form of the pronunciation as propagated by our foreign masters and hence the popularity of the Indian News Channels using English as a medium of communication is in vogue. Just imagine if a First Generation Learner from the Sundarbans or as a matter of fact from remote corner of Chattisgarh or Jharkhand is asked to follow BBC to learn English will he / she ever have the interest to attend such lessons as according to them the only person knowing English is the *Masterji* (Teacher) and even that person teaches English by translating the same in his mother tongue though the teacher is fully aware that teaching grammar prescriptively through study of rules will only incline the student towards the mother tongue. Next comes **speaking** ability in English. English tends to be a *stress-timed language* - this means that stressed syllables are roughly equidistant in time, no matter how many syllables come in between. Most of the Indian languages are *syllable-timed*, with each syllable coming at an equal time after the previous one. Learners from these languages often have a *staccato* rhythm when speaking English that is disconcerting to a native speaker.

Stress in English more strongly determines vowel quality than it does in most other world languages. For example, in some varieties the syllables *an, en, in, on* and *un* are pronounced as homophones, that is, exactly alike. Native speakers can usually distinguish *an able, enable,* and *unable* because of their position in a sentence, but this is more difficult for inexperienced English speakers. Moreover, learners tend to over pronounce these unstressed vowels, giving their speech an unnatural rhythm. The syllable structure too creates a problem along with

intonation and collocation. For example, nouns and verbs that go together (ride a bike/ drive a car). Native speakers tend to use chunks of collocations and the Indian learners make mistakes with collocations in their writing/speaking which sometimes results in awkwardness. The probable way to develop speaking skills requires instructors who are native speakers or have native-like fluency in the foreign language so that they can actually correct the pronunciation as well as the intonation of the foreign language learners. Hence it is largely dependent on the teacher's skill, rather than on a textbook and the sorry state is that not all teachers are proficient enough in the foreign language.

Situation worsens when one starts **reading** lessons. It is said that this skill can be enhanced by reading as much as one can, reading aloud, reading for interest and reading for purpose. Now let me analyse this. India is a democratic country therefore freedom of reading is a fundamental right so one can read as much as he wants –even read aloud if he wants to provided he does not disturb anybody but the problem remains as to how he is reading and focus should be more on that than what he is reading. An example would illustrate this: A person is reading aloud the biography of Khushwant Singh. He says, "*Khushwant Singh is sikh*" but pronounces *sikh* as *sick*. Any passerby who is quite acquainted with the language will be shocked hearing that. But it is not the readers fault. He simply followed the Golden Rules he is instructed by his teacher. He is not aware of the fact that pronunciation changes the entire meaning. If such is the case then will the purpose be solved?

Coming to **writing** English the basic problem that people face is the common English errors that are mostly result of lack of knowledge of prepositions and also the spellings. A learner may spell the word by the sound but may not know to write the correct spelling.

The other problem that they generally face is the use of the phrasal verbs as the dictionary tells them the meanings of each word in isolation but they are quite at loss when these words are combined together. For example let us take the words *run* and *over.* The meaning of the word *run* is *To move, proceed, advance, pass, go, come, etc., swiftly, smoothly, or with quick action; said of things animate or inanimate* and that of *over* is *above, or higher than, in place or position, with the idea of covering* but the meaning of *run over* is different when it is used in the following sentence :

The boy was run over by a speeding car.

In this case the meaning is to *injure or kill by running over, as with a vehicle*. The learner is bewildered. Vocabulary is taught through bilingual word lists with reference to dictionaries and rote learning of words and their meanings and the usage is often avoided by the instructor.

Too much stress on the structures of grammar, phonetics and vocabulary finds the learners "in irksome confinement …without the hope of release and respite" (Lamb 86). Their only hope towards salvation is literature and it is the most effective means of language teaching.

An efficient ELT trainer, would always site everyday example during his classes. And literature being a reflection of society, an ELT trainer can easily refer to literary texts for such ready references. For a class comprising of children from the age of 4 to 12, a trainer can

refer to children's literature. Again, if the crowd comprises of youth, the trainer can site references from youth literature which would again be of great help for the trainees. In fact in the modern times our understanding of literature has become highly advanced with the revolution in linguistics. Ferdinand de Saussure's book *Course in General Linguistics* changed our understanding of the concept of language. He feels that there is no relation between a signifier and a signified. This means that there is no reason as to why a four legged animal is known as a dog in English. According to him the sound or pronunciation is wholly guided by the conventions of a particular society at a particular time. He also feels that the syntagmatic (i.e. position of the sign) and paradigmatic relation in signs greatly influences the understanding of a literary text. As languages are the product of society, literature is highly connected with socio historic and cultural basis.

Thus language, idea and society are interrelated and cannot be treated independently while the new critics consider a literary text to be an independent creation of the author. So with the progress of time despite all innovations in language and literature we have to conclude that understanding of both language and literature is complementary to each other and both is intrinsically linked to each other from various slants. Thus to encourage an efficient teaching and learning process a ELT trainer should always take help from literature even if he / she is teaching language. This can, however, be better understood if we take up literary pieces preferably, poems and show how effective English Language Teaching /Learning can be generated through literature.

Effective English language teaching/learning through literary texts for the users of English as a second language has been used since the days of British colonialism. Although literary texts provide ample scope for development in language proficiency, especially comprehension and writing skill, tools of modern linguistics can be effectively used for developing reading, listening and speaking skills. Emphasis should be placed on a learner centric mode of teaching that allows the learners to participate in the learning process and acquire skills more naturally. The learners should be encouraged to break the linguistic and cultural barrier to absorb the nuances of the second language through a psychological process. Literary genres like poems enable a learner to participate in the linguistically superior wordplay, rhythm, intonation and accentual patterns, along with the semantic, syntactical and stylistic variations.

The learning process can be made quite interesting by transforming the power of the printed words into effective linguistic signs rich in organic images appealing to the human senses. Imagery basically is the use of images. They may be the pictorial description or a simile or metaphor. For example, Shelly has used impressive imagery in his poems that can be used for language teaching. Shelley's images are a genuine mixture of abstract and concrete. His imagery is accurate. Use of imagery in both his poems, *Ode to the West Wind* (1819) and *To a Skylark* (1820) are interrelated according to the use of dominant motifs. Whereas in *Ode to the West Wind* (1819) the air animates the water, air and sea and the humanity at large with a authority, in *To The Skylark* (1820) the lark is the vital symbol which stand for the

transcendental perfection that Shelley always looked for in like, beyond human pain and sorrow. His brilliant use of images would probably be the best example for an ELT trainer while teaching imagery to the learners to enrich their capability to understand the language thereby developing their discourse. More and more use of such will in turn increase the vocabulary of learners and effective wordplay on part of the trainer will help the learners to grasp the varieties in the language usage.

In dealing with the most sensitive part of language, i.e. selection of words and phrases, Wordsworth's concept of *Poetic Diction* is perhaps indispensable. He believed that poetry should be composed with words (selective) "*really used by men*". He also said that there is no real difference between the words used in prose and the words used in poetry. In fact it is the selection of words and one's mastery over language that can help in creating a good piece of literature. So an efficient ELT trainer should have a clear understanding that unless one gains mastery over the language of literature (in different forms prose, poetry, short story, novel or a drama) he cannot excel in language.

An ELT trainer can refer to different famous and popular poems in his advanced sessions of rhetoric and prosody. Such references will not only enrich the quality of language classes but also enhance the trainee's skill in application of different technical elements in language. For example, *The Tyger* (1794) by Blake or *Ode to a Nightingale* (1819) is two most immediately impressive poems that an ELT Trainer can consult in this context.

Similarly, English language in the spoken form is patterned in stressed and unstressed syllables. The isochronous stress rhythm can be taught through a study in English prosody that we find in the best of the poems. Among the metrical forms Iambic pentameter is the most familiar metrical pattern in English. It consists of ten syllables. An unaccented syllable is always followed by an unaccented one in an Iambic pentameter line. The obvious examples of such a meter would be from Keats's *Ode to a Nightingale* (1819):

"My '***sense***, | as '***though*** | of '***hem***|-lock '***I*** | had '***drunk"*** (Keats 71)

or,

"Was '**it** | a '**vision,** | or '**a** | waking '**dream?"** (Keats 73)

Keats's *Ode to a Nightingale* (1819) is a poem of eight stanzas. Each stanza comprises of ten lines and is written in iambic pentameter excepting the eighth line, composed in iambic hexameter. This means instead of ten syllables the poem has only six syllables per line. Keats always maintained a regular meter in his poems but did not make it awkward or distraught. ABABCDECDE is the rhyming pattern in the poem. This would help the learner to have a grasp over the accent pattern if he reads the lines aloud.

Again Blake uses short tetrameter lines in his poem *The Tyger* (1794). The structure of the rhetorical questions and the rhyming pattern ensure that *The Tyger* (1794) remain a children's poem. Here the simple lyric format and the artless questions suggest the inquiring mind of a child, but the deeper issues in the poem of the tiger are the issues of a higher philosophy.

In the first stanza, the first three lines are trochaic and the fourth line starts with a spondee,

producing a kind of incantatory urgency. The powerful rhythm of the opening line itself gives us a sense of the tiger's energy and strength. The extreme example of the driving rhythm is the line "*What dread hand, and what dread feet?*"(Blake 9) in which every syllable except "*and*" can be read with a stress, giving the line a power. The break of the line suggests the stroke of a hammer. The penultimate stanza on the other reveals adult wisdom with the artlessness of the child, genuine distinctions between good and evil. Overall the rhythm of the poem conveys multiple connotations and the rhythm of the poem rightly goes well with the context. All through the poem there is the note of intense admiration and wonder for the terrified beauty and energy of the tiger. In terms of imagery *The Tyger* (1794) has a symbol laden meaning. *The Tyger* (1794) represents creating a universe in its violent and terrifying aspects. The symbolism of the tiger is a part of poem's discourse on some of the fundamental enigma in human life.

Taking the above two poems in consideration for being effective tool in language teaching for not only developing reading and speaking skills, but also developing imagination within the learner. Imagination is a creative, constructive, power. Every aspect of daily life involves imagination. People imagine as they talk and interact with others, make choice and decisions, analyze news reports, or assess advertising and entertainment (Kelly 1996). Creative thought and imagination are intimately related to higher-order thinking skills. Literature is essential to educating the imagination as it illustrates the unlimited range of the human imagination and extends readers personal visions of possibilities. Literature nourishes readers' creative process by stirring and stretching the imagination, providing new information ideas, and perspectives so that readers can imagine the possibilities and elaborate on original ideas. In this way, it expands readers; ability to express imagination in words and images.

Literature can appeal to the students with various learning styles. Literary texts are reliable sources of linguistic inputs and can help the students practice the four skills–speaking, listening, reading and writing. Literature can help the students enhance their perception of other cultures and societies. Indeed, literature is representational instead of referential. While referential language tends to communicate at only one level and is informational, representational language of literature considers the students and involves their feelings and perceptions of the real world. Literary texts help the students to activate their imagination and develop their emotions thus facilitating in effective language learning.

Works Cited

Bacon, Francis. *Francis Bacon: The Essays*, Penguin Classics.1985

Blake William. *Ancient of Days*. Cool Publications Ltd.2004

Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2022. Ethnologue: Languages of the World. https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200. Accessed 6 April 2022.

Kelly, A. Colette (ed). *Children's Literature: Discovery for a Llifetime*. Gorsuch Scarisbrick Publisher.1996.

Lamb, Charles. *The Last Essays of Elia*. JM Dent & Co.1903. Google Books. https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaeeY4paopfi6aUKG LRWxIyCOo6X1jzZxutyNiopFKvK8T6cdpuKwQ6DRWk8ZnrTYt3JkTiu4M7Q9WeO1p0wpOlOgpndAm7HAKSGOrBDVTP9gmyykqJtTY0f-7nMhsSR0g2YAqX7JLKjxR7-x44R5axTK70faTSwvEL5e slmgJxILUjls1KkcVQh7tNSoGBsuOQuBXlNLllC_O-7enVDw7jwAz4PTO0Pwn6vf7afSr15j-dK4G1ZC7_C8ZYTGqjUtZ0ISDH- Accessed 1 May 2021

Macaulay, Thomas B. M, and G M. Young. *Speeches by Lord Macaulay: With His Minute on Indian Education*. Oxford University Press. 1935.

Saussure , Ferdinand de . *Course in General Linguistics*, Open Court Classics. 2006.

Shelley, Percy Bysshe. *The Complete Poems of Percy Bysshe Shelley*.Modern Library.1994

Vendler, Helen. *The Odes of John Keats*. Harvard University Press. 2003

Wordsworth, William, and W J B Owen, *Preface to Lyrical Ballads*. Rosenkilde and Bagger, 1957

Shubhaiyu Chakraborty
Assistant Professor, Department of English,
Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, Nadia.

Text to Talkie : Exploring Shades of Women in Indian Film Adaptations

Pragya Bajpai

Indian cinema is one of the largest centers of film production in the world. It started in twentieth century in 1930s and went up to producing 200 films every year. In the long journey of cinema, films and media have played a significant role in transforming the society from conservative to progressive and modernized and also in influencing the image of women in the modern context. The portrayal of women in Indian cinema has undergone a substantial paradigm shift from objectified, stereotyped and victimized to assertive, fearless, independent women who take charge of their destiny against odds. The reel is a representation of real society and the influence of culture is quite palpable. The cinema reflects attitudes, beliefs and ideologies to reach out to a larger audience; its ability to personify the abstract ideas makes it a potential medium of striking a chord with the target audience. However, drawing inspiration from Indian novels of antiquity to modernity for adaptation isn't new in Indian film industry as people find it more enticing to watch an adaptation. Therefore, this study categorically looks at myriad hues of representation of women in film adaptations.

The films chosen for the study are: Bimal Roy's timeless film *Devdas* (1955)- an adaptation of Saratchandra's novel, *Sujata* (1959)- an adaptation of Subodh Ghosh's novelette, Guru Dutt's *Sahib Biwi Aur Ghulam* (1962)- adapted from Bimal Mitra's novel, *Guide* (1965)- an adaptation of RK Narayan's novel *The Guide*, Mira Nair's *The Namesake* (2006)- an adaption of Jhumpa Lahiri's novel of same name, *3 Idiots* (2009) based on Chetan Bhagat's *Five Point Someone* and Meghna Gulzar's *Raazi* (2018)- adapted Haider Sikka's novel *Calling Sehmat*. The analysis holds up for close examination the dynamic contribution of films in shaping the society by showcasing relevant social issues pertaining to women wrapped in the articulation of cinematic pleasures. This paper attempts to explore female subjectivity, consciousness and the need to theorize their inner desires and feelings through remarkably complex yet transparent roles of women in select film adaptations of Indian literary texts across time to trace the elements of feminism.

The phenomenal reception of the Indian cinema featuring growth of feminism and women in diverse roles justifies the national conscious awakening. However, Indian cinema works in an institutionalized manner yet the exposition of texts through adaptations has gradually set the stage for 'the making of the new nation' by projecting the cultural transformation that India has undergone. This further motivated the directors and film makers to understand the true purpose or meaning of media and gradually assumed a responsibility of sensitizing the nation and evoking a sensibility by critical reading of texts for a cause. A director prudently reads the implicit sub-text by delving deep into the female psyche besides analyzing the disguised gap

Bajpai, Pragya : Text to Talkie : Exploring Shades of Women in Indian Film Adaptations
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 101-107, ISSN 2249-4332

between the subjectivity of different genders. He internalizes a social issue before its final on-screen production while unfolding a narrative theme. Thus, cinema entails psychological and philosophical aspects of life while proving itself to be a potential medium to deliver quantum knowledge of gender identity and socio-cultural consciousness at large. It silently infuses strength in women by bringing them from the relegated margins to the center and by illustrating their suffering and angst.

Cinema became a mouthpiece to voice their long-denied concerns like discrimination, domestic violence, gender oppression, victimization, objectification, identity crisis and inequality due to stereotypes. However, several films have imposed the concept of an ideal women in the dominant patriarchal culture by crafting characters that are traditional role models to suit their interest where women are damsel in distress, frail, submissive and conformist with little or no room for their own set of beliefs and arguments. This kind of films raise questions on equality, gender stereotyping and interpretation of the ideal social construct. Snigdha Deshmukh rightly observes, 'Being a far cry from reality, such films create an inaccurate impression of the capabilities and interests of women and thus indirectly plant the seeds of inequality in the minds of people.' The impact of cinema certainly goes a long way in the success of a nation. Nevertheless, a significant change in content and gradual shift in redefining the female characters through the use of language, attitude, ideology, value system and beliefs can be identified from the classical Indian cinema to modern cinema in absolute terms. Jasbir Jain examines the historical perspective Indian feminism and she points out, 'Draupadi deconstructed the notions of chastity and *sati*; Sita, of power and motherhood; Kali, of violence; Puru's young wife, of sexuality; the *bhakta* women, of marriage and prayer.' (298)

One of India's greatest filmmakers and the film maestro, Bimal Roy has gained fame and recognition for his powerfully inspiring female-centric films in the golden era of 1950s and 60s in the postmodern context when women were still struggling to gain equal status and identity in India. He paved way for film adaptations and proved the potential of literature in contributing to onscreen depiction of social realism. Shoma Chatterji calls him 'the great magician of Black-and-White of India cinema' as points out that 'the women of his films had an identity of their own. Their stature was unimpeachable. They were emotionally 'independent'. They were not mere foils to the men or the other characters in the films. They created a niche for themselves.' He was one of the pioneers of Indian film adaptation and his exemplary films like *Devdas* and *Parineeta* immortalized the eminent novelist Saratchandra Chattopadhyay with powerful expressions and portrayal of unforgettable women characters who are defiant, assertive and have resisted exclusion or any infringement on the freedom of thought. Manohar Bhatia comments on his film that 'His (Roy) films highlighted progressive thinking, challenged brutal exploitation and showed the innate strength of women… presenting lifelike characters.' Bimal Roy's films dealt with the social conflicts sensitively with unique quality of realism infused in it leaving an indelible mark on the human psyche. Roy's representation of women has always been powerful agents of social change which makes his films a relevant source of

inspiration even in the modern context.

The poignant narrative of *Devdas* (1955), an example of his cinematic brilliance, exhibits rejection of societal norms through the character of Chandramukhi, the courtesan who is considered to be a fallen woman. She offers comfort and companionship to desolate and bereft Devdas. The film endows us with the detailed knowledge of the socio-cultural conservative norms of post-independent India in terms of personified traditional and cultural values; on one hand, Paro lives a dignified life of a married woman for the honour of her family exhibiting her limitation and inability to rebel against the norms and Devdas, on the other hand, too conforms to rules of his family. While on the contrary, Chandramukhi plays a pivotal role of a non-conformist and a free-willed woman by relinquishing her profession displaying her lifelong spiritual love and devotion for Devdas even though she is certain that her love would remain unrequited. Her gradual metamorphoses from being a disgraceful courtesan to a dignified devotee of Devdas remarkably defines a liberated woman's desire to live life on her own terms.

Based on Subodh Ghosh's novelette, the evocative film *Sujata* (1959) was a socially conscious intense film with humanitarian theme that displays a romance between a girl of the untouchable caste, Sujata played by Nutan and a Brahmin youth, Adhir played by Sunil Dutt, who encourages her by saying that even Mahatma Gandhi fought against caste discrimination. The film effectively disseminated a remarkable message about the struggle of a strong and assertive untouchable girl against the caste hegemony and victimization. The mentally agonizing fundamental issue of untouchability in India and struggle to fight against the oppression with powerful female subjectivity. The film is a fusion of realism and idealism that serves the purpose of bringing awareness and transforming the society. 'The story is told in a series of deft, unrestrained episodes, never lapsing into self-pity that could easily have marred it' says Shoma Chatterji in her review. The female protagonist, Sujata deals with the evils and prejudices of society assertively with Gandhian spirit epitomizing a fearless feminist, as Shoma further adds, 'Sujata is an ideological film as it presents the possibility of the ideal society in the spirit of Gandhi, who is Sujata's patron saint, saving her once from suicide and unfailingly offering comfort, strength and hope in her darkest moments.'

Guru Dutt's *Sahab Bibi Aur Ghulam* (1962), a film adaptation of Bimal Mitra's Bengali novel of same name, won several awards for its unconventional theme of platonic love between Meena Kumari, the lonely wife (Bibi) of an aristocrat (Sahib) and the impoverished servant (Ghulam) called Bhootnaath. The role of female protagonist featured subtle adultery in the mainstream cinema with a bold deviation from the trend while defying the restrictions and stereotypes. Chhoti Bahu is an epitome of Hindu values and worships her husband as God. The servant becomes her confidant and they fall for each other after facing rejection from her husband. She therefore mirrors a dichotomy between virtues and vices.

Bimal Roy's film, *Bandini* (1963) is a film adaptation of a Bengali writer Charu Chandra Chakrabarti's novel *Tamasi*. Having witnessed and experienced the lives of female prisoners

closely by the virtue of being a jail superintendent, the author created a fictional documentation of their lives. Narrated from the point of view of a woman, the film presents the life of a female prisoner, brilliantly played by Nutan in flashback. Bandini which means imprisoned is a titular metaphor of Kalyani, the protagonist, serving life imprisonment for a murder is represented as a character who epitomizes strength, suffering and sacrificing woman. It is a reflection of Kalyani's conflicting mind that explores genuine human conflicts with regard to love and hate. A female-centric film with fine depiction of realism ventures into the personal life of a simple village girl who revels in the world of poetry and explores various aspects of humanity. The film brings out the aspects of social circumstances in a person's life that compels someone to commit a crime.

The classic film, *Guide* (1965) emerged with an unforgettably pathbreaking and rebellious role of the protagonist, Rosie. The educated woman, Rosie personifies women liberation and defies both her husband and the social values for the sake of following her passion for dance. Her fearless attitude towards celebration of life with an independent thought process took the notions of the society a step forward. For Waheeda Rehman to play that offbeat role wasn't easy considering the not-so-progressive society nevertheless, surprisingly it came easy on the eyes and was appreciated by the audience. She created her own identity as a fearless actress in the male dominated world of film industry. The legendary actress, Waheeda Rehman recollects on how she was dissuaded by the people from accepting such an unconventional role not suitable for Indian film and she proudly shares in an interview, 'But luckily, I had an open mind and took the project because it was a film and not real life. My character was an inspiration for me. When the film became a hit and everyone found my character interesting, I remember those same colleagues sent me telegrams appreciating my performance.' That's how she victoriously emerged as one of the most exemplary talents of the bygone era of 60s after the undisputed success of the film. However, the success is equally attributed to the author RK Narayan for crafting such a challenging character of a woman synonymous to the free-spirited assertive woman.

The Namesake (2006) is a film adaption of Jhumpa Lahiri's novel of same name primarily presents a narrative dealing with the cross-cultural identity crisis. The author of the novel being a strong female herself and the director being an exceptionally talented and bold feminist lady, Mira Nair who specializes in making controversial films and documentaries on female exploitation, oppression and marginalization in the socio-cultural Indian context adds depth to Ashima's character in the film that delineates her feelings, emotions and her sense of alienation. A versatile and strong actress herself, Tabu, who has refrained from the hegemonic sphere of marriage in personal life, is rightly chosen to play the role of Ashima justifying the name that signifies a limitless or borderless person or one who can't be confined. Though her role apparently brings out the elements of nostalgia and is shown to be only confined to the role of a mother and a wife nevertheless she emerges as an embodiment of a woman who takes charge of her own life and creates her own journey. The film demonstrates female subjectivity

through Ashima, a personification of dedication, simplicity and serenity; despite her vulnerabilities, she stands tall against the odds and proves to be an epitome of strength and courage even in her confinement. Her character transcends her boundaries in terms of evolving above her identity while accepting her 'self' in the end. Jasbir Jain opines, 'Identity and self are often treated as synonyms. But they are not. Identities can be dependent on men or on externals like class, status- both economic and married- caste and culture, while self is an internal consciousness of strength, awareness and ability.' (298)

Tabu talks about her uncomplicated yet 'life-changing experience' with regard to the challenging role of Ashima in *Namesake*, '…It needs to move me. And when it does, I'm game.' Women find it fulfilling to perform such roles and do justice to it on screen because they grow with it and also witness the society grow in the process therefore, Tabu adds, 'The growth that I have seen in movies, and myself and that I've been able to apply to films is something that I am really happy about. To get the opportunities to grow with your work, and have your growth reflect in your work is an amazing thing.'

Another film that exemplifies Indian cinema is Rajkumar Hirani's *3 Idiots* (2009), an all-encompassing film that comes as a rude awakening enveloped in entertainment is based on Chetan Bhagat's *Five Point Someone*. It is a thought-provoking yet entertaining film that justifies its theme of questioning our education system. The film reminds of a short story *The University Days* by James Thurber who recalls his own college days and raises several questions on the ideology of what defines the purpose of education. The two female characters of Mona and Pia played as sisters by Mona Singh and Kareena Kapoor are essentially feminist in nature. Both the sisters represent fearless, assertive and liberated women in their own respective roles. Pia confronts her father to defend his students from his wrath because they tried to leak the question paper. She does that by revealing to him that her brother committed suicide as he succumbed to the pressure of her father's monumental career expectations. Being an independent fearless girl, Pia keeps displaying her little acts of courage by refusing to marry a controlling obsessed man and leaving the site of marriage only to find her love of life. Such roles never fail to infuse courage in women in general.

Meghna Gulzar's *Raazi* (2018) adapted from an ex-navy veteran Haider Sikka's novel *Calling Sehmat* showcases the journey of an extraordinary fearless young college-girl played by Alia Bhatt, who infiltrates Pakistan by marrying a Pakistani army officer, Iqbal to spy thus minimizing the scope of any suspicion and furnish information to RAW. Sehmat's impressive role as a homely bride and a dedicated trainee are treat to the eyes. Her patriotism and commitment to duty set new standards for the Indian masses. However, she loses her husband in bargain nevertheless, it doesn't deter her from encouraging her son to carry forward the legacy and join Indian armed forces. This was a much-needed empowering role of a woman and a refreshing change that was welcomed and applauded by the audience. Meghna Gulzar has exhibited her immense talent by dealing with the sensitive theme and intricacies of human relationships in an exemplary way. The colossal success of the film with such overwhelming

attitude and reception of the audience towards a woman-centric film validates the progressive thinking. Not just the society but the transition of commercial cinema into awakening form of entertainment is indeed reassuring. It's icing on the cake to watch such characters cocooned in the form of entertainment.

Cinema thus, being the most popular and accessible mode of recreational entertainment across the globe has made a sufficiently effective ground for showcasing fifty shades of women who are beyond the extreme binaries of ideal or flawed. The cinematographic representation of women has been really challenging for various actresses who rejected the taboos, challenged traditional female role models and found it convincing to perform roles that gave an identity to women at large. The roles have effectively crafted women as a personification and a magical blend of tradition and modernity or confused and sorted or non-conformist yet spiritual or emotional yet rebel. Cinema has widened the horizon of our understanding of what truly means to be a 'real woman' and embracing their desires as Geeta Patel asserts in an interview with Ankita Maneck, 'Feminism is about claiming your pleasure and desire.' Women are biologically designed to be fluid and accommodating which is why it's often misconstrued as their weakness and that subconsciously becomes a potential reason for objectification.

Thus, the Indian film adaptation of select novels have particularly more often than not served as a social canon of liberated women by unveiling and painting some idiosyncratic and unexplored shades of women in typical India context. Cinema has also proved that even women can carry entire film on their shoulders and successfully navigate too. It has greatly offered women a freedom of expression of their real self which influences the image and identity of women who are infused with a deeper sense of belonging to the culture and values. It offers a promising platform for better understanding of gender representation and socio-cultural expectations. The portrayal of such roles is synonymous with strong women. A palpable transition of the relatable female roles from every walk of life in films has been instrumental in shaping the perspective of the consumers towards women in totality and contributed to the pivotal evolution of egalitarian society.

Works Cited

Agarwal, Ruchi. "Changing Roles of Women in Indian Cinema." *Research Gate*. Web.January,2014. <www.researchgate.net/publication/279017811/Changing_Roles_of_ Women_in_Indian_Cinema>.

Bhatia, Manohar. "Bimal Roy – The Doyen of Indian Cinema." *The Times of India*. Web. 12 July, 2019. <timesofindia.indiatimes.com/readersblog/manufocus/bimal-roy-the-doyen-of-indian-cinema-4602/>

Chatterji, Shoma A. 'Women in the Films of Bimay Roy.' *The Citizen*. Web. 13 January, 2017. <www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/9/9671/Women-In-The-Films-of-Bimal-Roy#:~:text=The%20women%20in%20Bimal%20Roy's,other%20characters%20in%20the%20film>Chaterjee, Partha. "Indian Cinema : Then and

Now." *India International Centre Quarterly*. vol. 39, no. 2, 2012, pp. 45–53. *JSTOR*. Web. <www.jstor.org/stable/41804040>.

Chatterji, Shoma A. "'Sujata Review: Bimal Roy's Celluloid Poem on Social Evils." *Cinestaan*. 04 April, 2019. Web. <www.cinestaan.com/reviews/sujata-2748>.

Datta, Sangeeta. "Globalisation and Representations of Women in Indian Cinema." *Social Scientist*, vol. 28, no. 3/4, 2000, pp. 71–82. *JSTOR*. Web. <www.jstor.org/stable/3518191>.

Deshmukh, Snigdha. "Women and Indian Cinema – A Tale of Representation." *The MIT Post*. Web. 20 January, 2020. <themitpost.com/women-indian-cinema-tale-representation/>.

Gokulsing, K. Moti and Wimal Dissanayake. *Routledge Handbook of Indian Cinemas*. Routledge Taylor & Francis Group, 2013. Print.

Jain, Jasbir. *Indigenous Roots of Feminism*: *Culture, Subjectivity and Agency*. Sage Publications, 2011. Print.

Maneck, Ankita. "Feminism is not about shutting things down. It's about claiming your pleasure: Geeta Patel." *First Post*. 22 April, 2017. Web. <https://www.firstpost.com/living/feminism-is-not-about-shutting-things-down-feminism-is-about-claiming-your-pleasure-geeta-patel-3397836.html>

Mayne, Judith. *The Woman at the Keyhole: Feminism and Women's Cinema*. Indiana University Press, 1990. Print.

Mishra, Maitreyee and Manisha Mishra. "Marriage, Devotion and Imprisonment Women in Bimal Roy's Devdas and Bandini." Web. <manipal.edu/soc/research/research-list/marriage-devotion-and-imprisonment-women-in-bimal-roy-s-devdas-.html>.

Mukherjee, Shreya. "Tabu: Can't Label a Role as Good or Bad, a Character's Journey is Important." *The Hindustan Times*. 07 Nov 2019. Web. <www.hindustantimes.com/bollywood/tabu-can-t-label-a-role-as-good-or-bad-a-character-s-journey-is-important/story-OyEbzVZX32Qm6r9SeTqZaO.html. 20 Aug 2020>.

Wright, Neelam Sidhar, *Bollywood and Postmodernism : Popular Indian Cinema in the 21st Century*. Edinburgh University Press, 2015, Print.

Pragya Bajpai
Assistant Professor, Department of English
National Defence Academy, Khadakwasla
Pune - 411 023

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes.
   It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
   1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
   2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors
OPEN EYES
S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 18, No. 1, June 2021

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only